বাঙালী কোথায় ?

অমিতাভ চক্রবর্তী

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা ৭০০০৭৩

ভদ্র মোরা শান্ত বড়ো
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি
মুখের ভাব শিষ্ট অতি
অলস দেহ ক্লিষ্ট গতি
গৃহের প্রতি টান।
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রা রসে ভরা
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালী সন্তান।

রবীন্দ্রনাথ

নিবেদন

যুগান্তর পত্রিকায় "বাঙালী কোথায় ?" শিরোনামে প্রকাশিত ধারাবাহিক নিবন্ধগুলি জনমানসে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। সেই নিবন্ধগুলিরই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ এই গ্রন্থ। নতুন সংযোজনও কিছু করা হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন একটি অধ্যায়ঃ বেকার সমস্যা ও সে সম্পর্কে কে কী ভাবছেন। এই গ্রন্থের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সুধিজনের কাছে আমি ঋণী। ঋণী অগ্রজপ্রতিম কয়েকজন সাংবাদিকের কাছেও। আমার পক্ষে সকল ঋণই অপরিশোধ্য। তাঁদের সকলের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সূ চি প ত্র

এই লেখকের অন্যান্য বই

শোণিত রঙের ডাকবাক্স
ছোটদের বাঘের গল্প
হো হো রহস্য
কেমন করে সিনেমা তৈরি হয়

১. ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পে

বাংলা ও বাঙালী

ব্যবসা বানিজ্য ও শিল্পে

বাংলা ও বাঙালী

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বড় দুঃখে বলেছিলেন, বাঙলীরা নিজবাসভূমে পরবাসী। অপ্রিয় হলেও এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য ভাষন। এবং দুঃখের হলেও আজও এই খেদোক্তি সমান সত্য। স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পর এই সত্য উপলব্ধি করা গৌরবের নয়, লজ্জার। যা সত্য তা দুঃখের বা লজ্জার হলেও বলা দরকার। ইংবাজ শাসনে হয়ত আমাদের কোন প্রত্যাশা ছিল না, কিন্তু স্বাধীন ভারতেও বাঙালীর ভাগ্যাকাশে সূর্যোদয় ঘটল না, এটা পরিতাপের বিষয়। ১৮৭২ সালে হিন্দুমেলা যে স্বাদেশিকতার বীজ বপন করেছিল, তাই জাতীয়তাবাদের রূপ পরিগ্রহ করল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৯১৯ সালে গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে শুরু হল রাজনৈতিক আন্দোলন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিধ্বস্ততার আবর্তে সেই আন্দোলনের ও অন্যান্য ঘটনাবলীর পরিণতি ১৯৪৭ সালেব ১৫ আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভ। ঘটনাবহুল এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাংলা সবসময়ই সক্রিয় ও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। স্বাধীনতার পর ন্যায় বিচার ও ন্যায্য ব্যবহার আশা করাটা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক নয়। কিন্তু কার্যত ঘটেছে ঠিক বিপরীত। স্বাধীনতার আগে বা সেই সময়েও বাংলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যা ছিল আজকের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পব খণ্ডিত বাংলা, উদ্বাস্তু প্রপীড়িত এই পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসা বানিজ্য শিল্পে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর উত্তর মিলবে হালফিল কয়েকটি তথ্যের দিকে নজর দিলে।

তার আগে অবশ্য একটু গোড়ার কথা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া ভাল। সে আমলে বাংলার ব্যবসা বানিজ্য শিল্প সবই ছিল কলকাতাভিত্তিক। ২৯০ বছর আগে কলকাতার পত্তন। তখন কলকাতা গড়ে উঠেছিল একটি বন্দর হিসাবে। আর তখন ব্যবসা বানিজ্যই ছিল প্রধান। শিল্পের পত্তন তারও

পরে। তখনকার দিনে ব্যবসা ছিল প্রায় সবটাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে। তারা মাল কেনা বেচা করত আর এ কাজে তাদের সহায়ক ছিল দেশীয় গোমস্তারা। এই গোমস্তাদের জোরজুলুম ও অত্যাচারের শেষ ছিল না। পণ্যের যা আসল দাম তা তারা কিন্তু দেশী লোকদের কাছ থেকে কিনত এক-পঞ্চমাংশ দামে কিন্তু সাহেবদের কাছে বেচত পাঁচ গুণ বেশী দামে। তার উপর এরা সাহেবদের কাছ থেকে কমিশনও আদায় করত। যে সমস্ত মাল তারা কেনা বেচা করত তার মধ্যে ছিল চাল, সুপারি, ঘি, লবণ, খড়, বাঁশ, মাছ, চট, আদা, চিনি, আফিম, তামাক ইত্যাদি। তখন কলকাতা বন্দর থেকে যেসব মাল বৃটেনে রপ্তানি হত, তার মধ্যে ছিল তুলা ও রেশমজাত কাপড়, চিনি, তেল, মশলা, সোরা, পশমীশাল বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্য। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির ডিরেক্টররা বিলেত থেকে কলকাতার কর্মচারীদের ফরমান দিলেনঃ বাংলার রেশম বয়নশিল্পকে নিরুৎসাহ করে, কেবলমাত্র রেশম উৎপাদনকে উৎসাহ করা হোক। এই নীতি ক্রমে অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুসৃত হতে লাগল। বাংলার শিল্প মার খেল। বাংলাদেশ ক্রমে কাঁচামালের যোগানদার হিসাবে পরিণত হল।

আগে ভারত তথা এই কলকাতা বন্দর থেকেই বস্ত্র ব্রিটেনে রফতানি করা হত। অষ্টাদশ শতকের কিছু আগে থেকেই ব্যবস্থাটা উল্টে গেল। তখন থেকে বিলাতি বস্ত্র এদেশে আমদানি হতে লাগল। আর এ দেশ থেকে বিলাতে রপ্তানি হতে লাগল তুলা, রেশম, নীল ইত্যাদি কাঁচামাল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ৭২৬৬ মন নীল বৃটেনে রফতানি হয়। আর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে যে পরিমান বস্ত্র কলকাতায় ব্রিটেন থেকে রফতানি হয়েছিল, টাকার অঙ্কে তার মূল্য ছিল ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৮ টাকা। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকায়। এই ব্যবস্থা চলতে থাকে অব্যাহতগতিতে।

এরপর পটপরিবর্তন ঘটে উনিশ শতকের শেষার্ধে। এই সময় চা, চটকল, কয়লা প্রভৃতি শিল্পের পত্তন ঘটে। রেলপথে সংযোগ স্থাপিত হয় দূরপ্রান্তের সঙ্গে। দরিয়ায় চলতে শুরু করেছে বাস্পীয় জলযান। সুয়েজখাল কমিয়ে

দিয়েছে ইউরোপের সঙ্গে ভারতের দূরত্ব। কলকাতা শহরও ক্রমে হামাগুড়ি শেষ করে পায়ে পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে। পাকা নর্দমা হয়েছে, জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। রেতে মশা দিনে মাছির উপক্রম একটু কমেছে। বর্ধমান বা কৃষ্ণনগরের মত না হলেও ক্রমশঃ স্বাস্থ্যকর জায়গা হয়ে উঠছে। লোকজন বাড়ছে। ব্যবসার সুবিধার জন্য মানুষজনের ভিড় হতে লাগল। কলকাতা রূপ নিতে লাগল বন্দর-নগর হিসাবে। মানুষের প্রয়োজনেই দোকানপত্র গড়ে উঠতে লাগল। ব্যবসায়ী এখনও ইহুদি, ইংরাজ, ওলন্দাজ। ব্যবসায়ী ভিনপ্রদেশের লোকেরাও। উত্তরপ্রদেশ থেকে, বিহার থেকে ওড়িশা থেকে দলে দলে মানুষ এলো। নানা পেশার, নানা বৃত্তির। বাঙালীরা জড়িয়ে রইল দালালির কাজে, মাল কেনাবেচায়। সামান্য কয়েকজন সাহেবদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শিল্পের পত্তন করছেন, রকমারি বানিজ্য জাহাজ ভাসাচ্ছেন, বিলাতি পণ্য আমদানি করে পাইকারি ব্যবসায় টাকা ঢালছে। পূর্ববঙ্গের লোকেরা কলকাতায় খুলল পাটের আড়ত চটকলগুলির চাহিদা মেটাতে। ব্যবসা বানিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে কলকাতা ঝলমল করতে লাগল।

এরপর আবার বিপর্যয় শুরু হল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ইংরাজ রাজশক্তি পর্যুদস্ত হল। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হল। তার কুড়ি বছর আগে ১৮৮৫ সালে গঠিত হয়েছে কংগ্রেস। ১৯০৫ সাল থেকেই কলকাতার উপর থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তির দৃষ্টি সরে যায়। তখন গোটা ভারত সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় এসে গিয়েছে। বঙ্গভঙ্গের ঘটনার পর আর দেরি না করে রাজধানী স্থানান্তরিত হল কলকাতা থেকে দিল্লিতে। এর কয়েক বছরের মধ্যেই অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলির সদর দপ্তরও বঙ্গোপসাগর ছেড়ে আরব সাগরের তীরে চলে গেল। সেই ট্র্যাডিসন সমানে চলেছে। আজও সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর, যা কিছু এখনও কলকাতায় আছে, মাঝে মাঝেই বোম্বাই বা নয়াদিল্লি নিয়ে যাওয়ার কথা হয়। মূলত, এই দুটি কারণে, বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে এল।

ইতিমধ্যে আরও একটি ব্যাপার ঘটল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমির উপর নির্ভরযোগ্যতা এনে দিল। ব্যবসা বানিজ্য করে যে সব বাঙালী বেনিয়ান মুৎসুদ্দি বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন, তাঁরাও জমি কিনে জমিদার হয়ে বসলেন। যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যবসা বানিজ্যে ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ, তিনিও অতঃপর জমিদার বনে গেলেন। এই ভাবে বাঙালীরা ব্যবসা বানিজ্যে আর টাকা না খাটিয়ে জমি থেকে নিশ্চিন্ত আয়ের রাস্তাটাই বেছে নিলেন। এতে ক্ষতি হল। সেই সময়ই ইংরাজদের পাশাপাশি মাড়োয়ারি, গুজরাটিরা এদেশে ব্যবসা করতে আসে। সেই ধারা আজও অব্যাহত আছে। পরে যখন শিল্পের পত্তন হল, তখন সংখ্যায় কম হলেও বাঙালীরা কিছু কিছু শিল্প গড়ে তুলল। বস্ত্রশিল্প, চা শিল্প, চট শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে টাকা ঢালল। বাংলার শেফিল্ড হাওড়ার বেলিলিয়াস রোড পুরোপুরি বাঙালীদের হাতেই গড়া। তবু এই সময় শিল্পে একাধিপত্য ইংরাজদের হাতেই ছিল। এবং ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ মূল বিষয় থেকে সরে যায়নি। আসলে, যে শিল্পই গড়ে উঠুক না কেন, তা ম্যানচেষ্টার বা শেফিল্ড বা লিভারপুলের স্বার্থেই হয়েছিল। বরাবরই বাংলাদেশ ছিল বিকিকিনির হাট, কাঁচা মালের আড়ত। বিদেশী টাকা যা লগ্নী হত, তার মুনাফা অর্জিত হওয়ার পর সেই টাকা ইংলণ্ডেই ফেরৎ যেত। সেইজন্যই দেখা যায়, দেশ স্বাধীন হওয়ায় রাজ্যের শিল্পগুলিতে আমানত মূলধনের ভাণ্ডার একেবারে শূন্য হয়ে পড়ল। তখন নতুন করে অর্থ বিনিয়োগ না করলে শিল্পকে আর বাঁচানো যাচ্ছে না। এই খানেই বাঙালীকে আর একবার দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হল। বাঙালীর হাতে পর্য্যাপ্ত টাকা ছিল না নতুন করে লগ্নীর জন্য। সেই সুযোগটা নিল অবাঙালীরা। ক্রমে ক্রমে স্বাধীন ভারতে বাংলা ও বাঙালীর ব্যবসা বানিজ্য শিল্পে একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়ল।

সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, শিল্প-ভারতে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে। এখন প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে

যথাক্রমে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় স্থান থেকে ক্রমশ ষষ্ঠ স্থানে নেমে গেছে।

এই পিছু-হটার বিবিধ কারণের মধ্যে কাঁচামালের অভাব, বিদ্যুৎ ও পরিবহণ ব্যবস্থার জটিলতা এবং কেন্দ্র কর্তৃক নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার মঞ্জুরী ও অর্থদানে বিলম্ব অন্যতম বলে সরকারী মহল বলছেন। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ১৯৭৭-৭৮ সালের শিল্প-সমীক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন তাতে শিল্পায়নে পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়ার তথ্যাদি যুক্ত হয়েছে। এই রিপোর্টে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ ১৯৭৬-৭৭ সালে মহারাষ্ট্রের পর শিল্পোন্নত রাজ্য ছিল। কিন্তু ১৯৭৭-৭৮ সালে গুজরাট সেই স্থান দখল করেছে। পশ্চিমবঙ্গ একধাপ নেমে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক বিকাশের হার ৩০ বছর ধরে সেই এক শতাংশই রয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের চাইতে ২০ শতাংশ বেশি শ্রমিক নিয়ে মহারাষ্ট্র পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় ১১০ শতাংশ বেশি উৎপাদন করছে। পশ্চিমবঙ্গে তালিকাভুক্ত শিল্প কারখানার সংখ্যা ৫৯৫০টি, স্থায়ী মূলধন হল ১,৩৯,১৭০ লক্ষ টাকা। মোট কর্মীর সংখ্যা হল ৯ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫৪১। এঁরা মোট আয় করেছেন ৬৭,১৮৩ লক্ষ টাকা। উৎপাদন হয়েছে ৪,০৭,৮১৩ লক্ষ টাকার পণ্য।

মহারাষ্ট্রে ঐ সময়ে কলকারখানার সংখ্যা ছিল ১৩,০৭৫টি, স্থায়ী মূলধন ছিল ২,৯৯,২৯৭ লক্ষ টাকা, কর্মীর সংখ্যা ছিল ২,৯৯,২৯৭ জন। ওরা আয় করেছেন ৯৭,২৮৬ লক্ষ টাকা। মোট উৎপাদন হয়েছে ৯,৩৩,৩৬৫ লক্ষ টাকা। গুজরাটের ঐ সময় কারখানার সংখ্যা ছিল ৯,৬৫৫টি, স্থায়ী মূলধন ১,৭১,০২০ লক্ষ টাকা, কর্মীর সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৩৬ হাজার। এরা আয় করেছেন ৩৫,২৯৩ লক্ষ টাকা। মোট উৎপাদন হয়েছে ৪,২২,১৮৬ লক্ষ টাকার জিনিস। এককালে শিল্পোন্নত পশ্চিমবঙ্গ ভারতের বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় স্থানে ছিল। এখন পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে সারা ভারতের মাত্র ৮ শতাংশ। সারা পূর্ব ভারতের সকল রাজ্য মিলিতভাবে যেখানে সারা

ভারতের মাত্র ১৫ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে সেখানে একমাত্র মহারাষ্ট্রই ১৬ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কেন অগ্রসর হতে পারছে না, সেই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি কিছু তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন অজুহাতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের বিভিন্ন প্রকল্প মঞ্জুরীতে কেন্দ্র কর্তৃক বিলম্বের ফলে শিল্পের বিকাশ ও প্রসার সম্ভব হচ্ছে না। হলদিয়ায় ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠা, রাসায়নিক কারখানা, জাহাজ তৈরী ও মেরামতির কারখানা, দুর্গাপুরে ট্রাক তৈরীর কারখানাসহ বিভিন্ন প্রকল্প মঞ্জুরীতে দেরি হচ্ছে। একটি হিসাব থেকে দেখা গিয়েছে যে মহারাষ্ট্র ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত গত তিন বছরে যেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠার ৩৫৫টি লেটার অবইনটেন্ট এবং ২৯৪টি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল লাইসেন্স পেয়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ ঐ সময়ে পেয়েছে যথাক্রমে ১১০ ও ১১৯টি। ১৯৭৮-৭৯ সালে যেখানে মহারাষ্ট্রে ব্যাঙ্কের ঋণ এসেছে ৩৫০০ কোটি টাকা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ১৬০০ কোটি টাকা।

শুধু কি তাই, শিল্প যেমন কোনঠাসা হয়ে পড়েছে, তেমনি এই রাজ্যের শিল্পে এই রাজ্যেরই অধিবাসী বাঙালীরা ক্রমে পিছু হঠছে। নিজের রাজ্যের শিল্পেই বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা দিনের পর দিন হ্রাস পাচ্ছে। ভারতের আর কোন রাজ্যে ঠিক এই রকম ঘটনা ঘটছে কি? গুজরাটে বা মহারাষ্ট্রে বা কেরলের কলেকারখানায় কি সেই সেই রাজ্যের শ্রমিকরা সংখ্যালঘু? অথচ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দশটি শিল্পে এ রাজ্যের শ্রমিক দিন দিন কোনঠাসা হয়ে পড়ছে। এমনিতেই ওই দশটি শিল্পে এ রাজ্যের লোকেরা চির সংখ্যালঘু। বামফ্রণ্টের গত তিন বছরের শাসনকালে এই শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা হিসাবে আরও কমে গিয়েছে। রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তর থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত 'লেবার ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ১৯৭৯' গ্রন্থটিতে তথ্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ওই দশটি শিল্পে ১৯৭৭ সালে মোট শ্রমিকের ৪২.৮৯ শতাংশ ছিলেন বাঙালী আর ১৯৭৯ সালে ওই সংখ্যা কমে হয়েছে ৪১.৪৫ শতাংশ। রাজ্যের প্রধান দশটি শিল্প হল—

(১) সুতাকল ও তাঁত, (২) চটকল, (৩) ইঞ্জিনীয়ারিং, (৪) লোহা ও ইস্পাত, (৫) রাসায়নিক, (৬) কাগজ, (৭) কাচ, (৮) রবার, (৯) ছাপাখানা ও বই বাঁধাই এবং (১০) অন্যান্য।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী ওই দশটি শিল্পে ১৯৭৭, ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে নিযুক্ত বাঙালী ও অন্য রাজ্যের শ্রমিকদের শতকরা হিসাব এখানে পর পর তুলে ধরা হল: পশ্চিমবঙ্গ ৪২'৮৯ ; ৪২'৪১, এবং ৪১'৪৫ ; বিহার ২৯'৩২, ৩০'৫৪, ২৯'৫৬ ; ওড়িশা ৫'৫৩, ৫'৪৫, ৫'৫৭ ; উত্তরপ্রদেশ ১৬'৯২, ১৬'২৮, ১৮'৫৪ ; অন্যান্য রাজ্য ৫'৩৪, ৫'৩২, ৪'৭০।

সরকারী মতে ১৯৭৬ সালে এ রাজ্যে ওই দশটি শিল্পের ৬০০৯টি সংস্থায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৮,৩৫,২৩৬। আর সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৮ সালে ওই দশটি শিল্পে ৬২৮৭টি ইউনিটে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮,৬৯,৬৭৬। শ্রমিক সংখ্যা ছিয়াত্তর থেকে আটাত্তর—তিন বছরে ৩৪,৪৪০ জন বাড়লেও এদের অধিকাংশই অন্য রাজ্যের। আর এই তিন বছরে চারটি প্রধান শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা আদৌ না বেড়ে বরং কমে গিয়েছে। যেমন ১৯৭৬ সালে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা যেখানে ছিল ৩,৪৭,৫৩২, সেখানে ১৯৭৮ সালে কমে গিয়ে হয়েছে ৩,২১,৫২০। কাগজ শিল্পে ১৯৭৬ সালে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৭,৩০৩, আর ১৯৭৮ সালে ১৭,২২২। রবার শিল্পে ১৯৭৬ সালে শ্রমিক ছিল ১৫,৬৯৫ জন আর ১৯৭৮ সালে ১৪,৫৩২ জন। ছাপাখানা ও বই বাঁধাই শিল্পে ১৯৭৬ সালে ছিল ১৫,২০২, ১৯৭৮ সালে ১৫,০১৫ জন। এই সময় সুতাকল ও তাঁত শিল্পে তিন বছরে মাত্র তিনজন শ্রমিক চাকরি পেয়েছে। ১৯৭৬ সালে ওই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫৪,৩৪০, আর ১৯৭৮ সালে ৫৪,৪৪৩। অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত শিল্পে সবচেয়ে শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে—১৯৭৬ সালের ৭৫,০৬৩ জন বেড়ে ১৯৭৮ সালে হয়েছে ১৩২,৬০৮ জন। ওই সময় রাজ্যের ৭৪টি চটকলে তিন বছরে শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে ১৬৫২ জন। ইঞ্জিনীয়ারিংএর পরই এ

রাজ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক নিয়োগকারী শিল্প চা-বাগান যেখানে ছিল ২৬২টি সেখানে ১৯৭৮ সালে বাগানের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২৫৯টি।

১৯৭৯ সালের শিল্পওয়ারি হিসাব অনুযায়ী চটকলে মোট শ্রমিকের ২৭.৮৪ শতাংশ বাঙালী, ৩৮.৫২ বিহারী, ৪.৯৮ ওড়িয়া, ২৩.০২ উত্তরপ্রদেশী এবং ৫.৬৪ অন্য রাজ্যবাসী। কাচ শিল্পে বাঙালী ৩৯.৫২, বিহারী ২৪.৮২, ওড়িয়া ২.৪৩ উত্তরপ্রদেশী ৩০.৮৬ এবং অন্য রাজ্যবাসী ২.৩৭ শতাশ। কলকাতা পুরসভার জঞ্জাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং দফতর দুটির ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে নিযুক্ত শ্রমিকের শতকরা হিসাব উল্লেখ করে ওই গ্রন্থে বলা হয়েছে, সাতাত্তর সালে মোট শ্রমিকের মাত্র ১০.৭০ শতাংশ ছিল বাঙালী। আর আটাত্তরে ১০.৭৭ শতাংশ কর্মী বাঙালী। এর পাশে বিহারী কর্মীর শতকরা হিসাব ১৯৭৭ সালে ছিল ৩৭.৬৬ এবং ১৯৭৮ সালে ৬৭.৪২ শতাংশ। ওড়িয়া কর্মী যথাক্রমে ৭.৫০ ও ৭.৫৭ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশী ১৪.০৯ ও ১৪.২১ শতাংশ অন্যান্য রাজ্যবাসী কর্মীর যথাক্রমে ০.০৮ ও ০.০৩ শতাংশ।

কেন এই অবস্থা ? এই রাজ্যের বা এই রাজ্যের অধিবাসী বাঙালীদের অপরাধ কি ? অপরাধ কারো নয়। এই অবস্থার জন্য মূলত দায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু নীতি। তারপর দায়ী, অবাঙালী ব্যবসায়ীদের বা শিল্পপতিদের পশ্চিমবঙ্গ বিরোধী সংগঠিত প্রয়াস। সবশেষে বোধকরি বাঙালীদের নিজেদেরও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি এই অবস্থার জন্য দায়ী। অবশ্য দেশ বিভাগের দরুণ পশ্চিমবাংলাকে যে দারুন সঙ্কটের মুখে পড়তে হয়েছিল, সেটাই সবার আগে বিচার্য।

দেশ বিভাগের দরুণ যাবতীয় দায় এক পশ্চিমবাংলা ও পাঞ্জাবকেই বহন করতে হয়েছে। পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের যে পরিমান সহৃদয় ব্যবহার দেখা গিয়েছে বাংলার উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে এর ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার চেয়ে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের জন্য অর্থ বরাদ্দও করেছেন

অনেক বেশি। উদ্বাস্তু সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা হওয়া সত্বেও অন্য কোন রাজ্য এর দায় ঘাড়ে নেয়নি। সবচেয়ে বড় প্রমাণ, স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরেও উদ্বাস্তুরা উদ্বাস্তুই থেকে গেল, ভারতের স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা পেল না। আসামে তারা এখন বিদেশী, দণ্ডকারণ্য থেকে তাদের চলে আসতে হয়। আন্দামানে কোনঠাসা। এই যে উদ্বাস্তু সমস্যা, এ দিকে লক্ষ্য রেখে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি শিল্প ব্যবসা বানিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া উচিত ছিল, তার কিছুই হয়নি। বরং এই সময় পশ্চিমবঙ্গকে একরকম বাদ দিয়েই অন্যান্য প্রদেশে শিল্পবিকাশের এক সংগঠিত প্রয়াস চালাতে দেখা যায়। দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য স্বাধীনতার পর সব প্রদেশে শিল্পের বিকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে সুসম ব্যবস্থা কায়েম করার নীতি গ্রহণ করা হল। সব প্রদেশ বললেও, পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিয়ে অন্য প্রদেশগুলির উপর জোর দেওয়া হল না। কেন? উত্তর পশ্চিমবঙ্গ তো শিল্পে এগিয়েই আছে। আশ্চর্যের বিষয়, উদ্বাস্তু সমস্যা যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের প্রসারকে অনিবার্য করে তুলেছে, এই সত্যটির প্রতি আদৌ নজর দেওয়া হল না। সুসম শিল্প বিকাশের জন্য কী করা হল? পশ্চিমবঙ্গকেই তার জন্য ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য করা হল। পশ্চিমবঙ্গের ঘাড় ভেঙে বোম্বাই, পাঞ্জাব, কর্ণাটক, তামিলনাড়ুতে শিল্পের বিকাশ ঘটানো হল। কয়লা লোহা ও ইস্পাতের দামে সমতা আনা হল। ফলে, পশ্চিমবঙ্গ স্থানীয় প্রাকৃতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হল। পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গকে কোন সুবিধা দেওয়া হল? অন্ততঃ দু'টি ক্ষেত্রে তূলা ও কেমিকেলসের পরিবহন শুল্কে ভরতুকি দেওয়া উচিত ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার সে ব্যাপারে নীরব। ফলে, পশ্চিমবাংলার বস্ত্র শিল্প মার খেল। একটা অগ্রগামী ভেষজ শিল্প নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, পশ্চিমবঙ্গ তো শিল্পে উন্নত? কাজেই অর্থবিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির কাজ হবে অন্য রাজ্যে শিল্পে টাকা লগ্নী করা। তাই করা হল। ফলে, স্বাধীনোত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে আর্থিক সহায়তা তেমন জোটেনি। আজও এই ধারা অব্যাহত আছে। তারপর, কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই এমন কিছু পরিকল্পনা নিয়েছেন, যা পশ্চিমবঙ্গে হওয়ার কথা, অথচ শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গকে

বাদ দিয়ে অন্যত্র হয়ে গেল। এইসব ঘটনার পেছনে আছে নানারকম রহস্যজনক কারণ। সবটা না জানলেও, দু'টি কারণ খুব স্পষ্ট: (১) গান্ধীবাদী রাজনীতির আড়ালে উগ্র প্রাদেশিকতা। সর্বভারতীয়বোধের মোয়া সামনে ধরে এক পশ্চিমবঙ্গ বাদে অন্য সব প্রদেশের রাজনীতিবিদরাই নিজের নিজের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। এ সব ব্যাপারে উগ্র প্রাদেশিকতাও কখনও কখনও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আজ আসামে যে নগ্নরূপ প্রকাশ পেয়েছে. অন্য রাজ্যগুলিতেও তারই ব্যাপার ঘটছে, তবে হৈ চৈ করে নয়। ওড়িশার পরাদীপে যে জাহাজ নির্মাণ কারখানাটি হল, তা হওয়ার কথা ছিল হলদিয়ায়। হাজার চেষ্টা করেও এই স্থানান্তরণ ঠেকানো যায়নি। সান্ত্বনা পুরস্কারের মত হলদিয়ায় একটি জাহাজ মেরামতী কারখানা করার বিষয়টি নিয়েও কত না টালবাহানা। সরকারী উদ্যোগে বেসিক ড্রাগ তৈরীর কারখানা হওয়ার কথা কলকাতায়। সব ঠিকঠাক। শেষ পর্যন্ত হল হায়দারাবাদে। ইলেকট্রোনিক শিল্পে পথিকৃৎ পশ্চিমবঙ্গ। একটি শিল্প এই রাজ্যেই হওয়ার কথা। একেবারে শেষ মুহূর্তে কেন্দ্র মতটা বদলে ফেললেন। শিল্পের ঠিকুজি চলে গেল মহারাষ্ট্রের হাতে। হলদিয়ায় সার কারখানা আজও হল না। দু'টি রবার কারখানা সরকার অধিগ্রহণ করবেন। সব ঠিক। হঠাৎ দিল্লির কর্তাব্যাক্তিরা গম্ভীর গলায় জানিয়ে দিলেন, হবে না। বরং ও দু'টো কারখানা কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে (অর্থাৎ কোন মাড়োয়ারিকে?) বিক্রি করে দেওয়া হোক। এসব ঘটছে, আগেও ঘটেছে।

অন্য কারণটি হল অবাঙালী ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠিত প্রয়াস। সমগ্র পূর্বাঞ্চলে আগে শিল্পপতিরা এসে শিল্প গড়তেন। কারণ, এখানে হাতের কাছে কয়লা, লোহা, ইস্পাত ও কিছু কাঁচামাল পাওয়া যেত। আর ছিল কলকাতার মত বন্দর। এই শিল্পপতিদের আব্দার রাখতেই কয়লা, লোহা ও ইস্পাতের দামে সমতা আনা হল। সুতরাং এখন পশ্চিমবঙ্গের কয়লা, বিহারের লোহা ইস্পাত নিয়ে যে কোন জায়গায় শিল্প গড়া যায়। তদুপরি পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য রাজ্যে অর্থবিনিয়োগ সংস্থাগুলির কাছ থেকে বেশি টাকা পাওয়া যায়।

সুতরাং পশ্চিমবাঙলায় এখন আর নতুন শিল্পের পত্তন করতে বেসরকারী শিল্পপতিরা আগ্রহী নয়। কারণ হিসাবে তাঁরা দেখান, শ্রমিক বিরোধ। ইদানিং যোগ হয়েছে লোডশেডিং। এই অবাঙালী ব্যবসায়ীদের হাতেই কাঁচামাল সরবরাহের কলকাঠি। বাংলার তাঁতীদেরও নির্ভর করতে হয় অবাঙালী ব্যবসায়ীদের উপর সুতোর জন্য। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের কাঁচা-মালের আড়ৎদারও অবাঙালী ব্যবসায়ীরা। এসব ক্ষেত্রেও অবাঙালী ব্যবসায়ীরা পশ্চিমবঙ্গ বা বাঙালীর প্রতি সে উদার দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করেন না, তার বহু প্রমাণ আছে। বাকিরইল বন্দরের সুযোগটুকু। অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা কলকাতা বন্দরের শ্রমিক বিরোধের কারণ দেখিয়ে একটি বিকল্প বন্দর গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁদেরই ইচ্ছায় গড়ে উঠল সুদূর গুজরাটে কাণ্ডলা বন্দর। সেই বন্দরকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করতে আসামের চা কাছাকাছি কলকাতা বন্দরে না এনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গোটা ভারত পরিক্রমা করে কাণ্ডলা বন্দরে। আর এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে শুল্ক কিছু ছাড়ও তাঁরা আদায় করতে পেরেছেন। এই একটি উদাহরণই কি যথেষ্ট নয় কেন্দ্রীয় সরকার ও অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের আসল চেহারাটা স্পষ্ট করতে ?

অর্থাৎ শোষণ থেকেই গেল। ইংরাজ শাসনে যা ছিল, আজও তাই রইল। কেবল চেহারায় কিছু রকমফের ঘটেছে। স্বাধীনতার পরেও বাঙালীরা শোষণের হাত থেকে মুক্তি পায়নি। নয়াদিল্লি থেকে স্বদেশী শোষনের শিকার পশ্চিমবঙ্গ তাই দিনের পর দিনে শিল্পে ব্যবসা বানিজ্যে পিছু হঠছে। এমন কি, এই রাজ্যে বাঙালীরা আজ চাকরিও পায়নি।

এই অবস্থার জন্য রাজ্য সরকারের ভূমিকাও কম দায়ী নয়। স্বাধীনতার পর অন্যান্য রাজ্য শিল্প বিকাশের জন্য যতটা উদ্যোগী হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকার ততটা হয়নি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একটা দুর্গাপুর করে যতটা উপকার করেছিলেন, কয়লার দামে সমতা আনার প্রস্তাবে সায় দিয়ে তার দশগুণ ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের নিজেদের কি কোন ত্রুটি নেই ? এই প্রশ্নটিও ওটা স্বাভাবিক। সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত বাঙালী

ব্যবসা বানিজ্য করার থেকে একটা যেমন তেমন চাকরি করা নিরাপদ মনে করে। এই মানসিকতা সুনিশ্চিতভাবেই গুজরাটি, মারাঠি বা মাড়োয়ারীর থেকে ভিন্ন। এই মানসিকতা অবশ্যই বাঙালীর কিছু ক্ষতি করেছে। তবু, কথায় আছে বিপদে পড়লে বাঘেও ধান খায়। বিপদ ঠিকই এসেছিল, কিন্তু ধান কৈ? এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে সুসম শিল্প বিকাশের ফলে, সব রাজ্যই শিল্পসমৃদ্ধ হল, পশ্চিমবঙ্গে সমৃদ্ধি দূরে যাক, যা ছিল, তাও নিচিহ্ন হতে চলেছে। স্বাধীন ভারতে এই কি ছিল প্রত্যাশিত?

বা ঙা লী

কো থা য় ?

শিল্প সমীক্ষা

।

চা

চট

কয়লা

দেশলাই

কাচ

হোসিয়ারি

সাবান

চর্ম

মুদ্রণ

রবার

বস্ত্র

হোটেল

তাঁত

ইঞ্জিনীয়ারিং

পরিবহন

চলচ্চিত্র

ভেষজ

চা

আচার্য জগদীশ চন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু তখন জলপাইগুড়ি ডিভিশনের ডেপুটি কালেকটার। তাঁর হাতেই ছিল চা-বাগিচার জমি বরাদ্দ ও বণ্টনের অধিকার। তিনিই বাঙালীদের প্রথম চা বাগান তৈরিতে উৎসাহ দেন। তাঁরই অনুপ্রেরনায় চা শিল্পে বাঙালীর প্রথম প্রবেশ। সেই থেকে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ডুয়ার্সের চা বাগানগুলির ৭০ শতাংশ ছিল সাহেবদের হাতে। বাকি ৩০ শতাংশ ছিল বাঙালীর হাতে। স্বাধীনতার পর থেকেই এই ছবি দ্রুত বদলাতে লাগল। এখন প্রায় ৩৫০টি চা বাগানের ৭০ শতাংশই মাড়োয়ারীও গুজরাটিদের দখলে। ২০ শতাংশের কিছু বেশি এখনও সাহেবদের হাতে। বাঙালীর হাতে আছে ১০ শতাংশেরও কম। চা শিল্পে বাঙালীর অবস্থা এখন চায়ের কাপের তলানি মাত্র।

দেশ বিভাগ এই শিল্পের বিস্তর ক্ষতি করেছে, বিশেষ করে বাঙালীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। স্বাধীনতার পর সাহেব কোম্পানিগুলি বিক্রি হতে শুরু করল। মাড়োয়ারি ও গুজরাটিরা সেইসব বাগান কিনে নিতে লাগলেন। দেশ বিভাগে টাল-মাটাল বাঙালীরা নতুন করে বাগান কেনার ঝুঁকি নিতে পারলেন না। যাঁরা কিনতে চেয়েছিলেন তাঁরাও পারলেন না টাকার অভাবে। অবাঙালীরা সাদা ও কালো মিলিয়ে অনেক বেশী দাম দিয়ে সাহেবদের কাছ থেকে বাগানগুলি কিনে নিলেন। নতুন বাগান তো কেনা হলোই না উপরন্তু যেসব বাগান বাঙালীর হাতে ছিল, তাও একে একে হাতছাড়া হতে লাগল। এর কারণ দুটো। (১) বাঙালী বাগান-মালিকদের বেশির ভাগই ছিলেন পূর্ববঙ্গের মানুষ। দেশ বিভাগের পর এই রাজ্যে আসা আত্মীয়-পরিজন অনেকেই দু'মুঠো অন্নের জন্য আশ্রয় নিলেন চা বাগানে। কিছুদিনের মধ্যেই বাঙালীর চা-বাগানগুলির 'বাবু' কর্মচারীর সংখ্যা হু হু করে বেড়ে গেল।

(২) ১৯৬৭ সাল থেকে চা বাগানে শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন ও মজুরী বেড়ে গেল। অথচ আয় বাড়ল না। বাড়ল না তার কারণ, ইতিমধ্যে আন্ত-র্জাতিক বাজারে ভারতের বেশ কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়ে গেল। সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল চীন ও সিংহল। এই অবস্থায় বাঙলীর বাগানগুলির লোকসান হতে লাগল। এই অবস্থাটা সামলাতে দরকার ছিল আরও বেশি পরিমান অর্থ লগ্নী করা। সে টাকা মাড়োয়ারি গুজরাটিদের ছিল বা আছে। বাঙালীর নেই। ফলে বাঙালীর যাও ছিল তাও ধরে রাখতে পারল না। এখনও যা আছে তারও স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়। বাঙালীকে বাঁচাতে এই সরকারও কোন উদ্যোগ কখনও নেননি।

এই শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যেও বাঙালীর সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। 'কুলি' বলে পরিচিত শ্রমিকদের সকলেই বংশ পরম্পরায় ওই ভাবেই কাজ করে আসছেন। বাঙালীর স্থান ছিল ম্যানেজার থেকে শুরু করে অফিসের বাবু পর্যন্ত। স্বাধীনতার আগে এইসব পদে বাঙালীর সংখ্যা-ধিক্য ছিল। কিন্তু বাগানগুলি অবাঙালীরা কিনে নিতে শুরু করায় বাঙালী বাবু ও ম্যানেজারের সংখ্যাও কমতে থাকে। অবাঙালীরা নিজেদের বাগানে বাঙালী (একমাত্র ডাক্তার ছাড়া) নিয়োগ একরকম অনেক দিন ধরেই বন্ধ রেখেছে। এখন চা বাগানে বাবু ও ম্যানেজার পদে ৯০ শতাংশই অবাঙালী।

চা শিল্পে উৎপাদন ছাড়াও আছে চা বিক্রির ব্যবস্থা। চা রপ্তানি করার আগে আছে চা-এর নীলাম। যাঁরা নীলামে চা কেনেন এবং বিক্রি করেন— এই দুইয়ের মধ্যে আছে আর একটি শ্রেণী—দালাল। স্বাধীনতার আগে রফতানিকারক চা-ক্রেতা সবই ছিলেন সাহেব। স্বাধীনতার পর রাশিয়া চা কিনতে শুরু করার পর অবস্থা বদলাতে থাকে। এখন রপ্তানিযোগ্য চায়ের ৪০ শতাংশ কেনেন সাহেবরা। বাকি ৬০ শতাংশই ভারতীয় ক্রেতা। এর মধ্যে অবাঙালীর সংখ্যা শতকরা ৯০ ভাগ। আর কলকাতা ও শিলি-

গুড়ি—দু'জায়গাতেই দালালদের মধ্যে মাত্র ১ জন করে বাঙালী। বাকি সবই অবাঙালী।

চট

হুগলি নদীর দুই তীরে চটকলগুলি এখন আর ইংরাজ শোষনের নিদর্শন নয়। এগুলি স্বাধীন ভারতের শিল্প সম্পদ। কিন্তু এগুলি, পশ্চিমবাংলায় অবস্থিত সম্ভবত সেই কারণেই এসব চটকলের সঙ্গে বাঙালীর কোন যোগ নেই। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে পূর্ববঙ্গের ভাগ্যকুলের রায়েদের দু'একটি চটকল ছিল। স্বাধীনতার পর তাও গেল। এখন চটকল সাম্রাজ্য পুরোপুরি মাড়োয়ারি তথা অবাঙালী শিল্পপতিদের কব্জায়। এরা পাট চাষীদের বিরুদ্ধে লাগাতার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, যার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাটের দাম কমিয়ে আনতে বাধ্য করা। ফি বছরই এটা চলছে। সরকারও দেখছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের যা কিছু করণীয় তা করা হচ্ছে কেবল গুজরাটের তুলা চাষীদের জন্য। পাটচাষীদের জন্য তাদের মাথা ব্যথা নেই। এই চটকল মালিকদের সুপরিচালনার ফলে একদিকে ৮০টি চটকলের মধ্যে এখন এসে দাঁড়িয়েছে ৬২টিতে। শিল্প না থাক, ঘরের উঠোনে কারখানায় বাঙালীর চাকরি তো হতে পারতো? না। তাও হওয়ার উপায় নেই। চটকলে বঙ্গ সন্তানের চাকরি সম্পর্কে সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন থেকে সঠিক এক চিত্র পাওয়া যাবে।

অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, উত্তর চব্বিশ পরগণা আর হাওড়ার গঙ্গার ধারে প্রায় দুলাখ চাকরি আছে। এই চাকরিগুলোর সর্বনিম্ন মাইনে সর্ব-

সাকুল্যে প্রায় সাতশো টাকা। এই চাকরিগুলিতে কিন্তু বঙ্গসন্তানদের কোনো ঠাঁই নেই। এখানকার চটকলগুলোর কথাটাই ধরা যাক। এমন নয় যে বঙ্গসন্তানরা চটকলের কাজ করতে পারেন না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা আর দক্ষিণ হাওড়ার চটকলগুলোতে কিন্তু শতকরা পঁচাত্তর জন চটকল শ্রমিক বাঙালী। ঐ মিলগুলোতে ওদের মোটমাট সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। তাই বাঙালী চটকলের কাজ করতে যায় না বা ওকাজ করতে পারে না এ বলা যাবেনা। উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে বঙ্গ সন্তানকে উপেক্ষা করবার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরা যে, আজকের দিনে বাঙালী সব রকম কাজ করতে চান। আর তা করছেনও। তাই চটকলগুলোতে বাঙালীর অন্ন সংস্থানের কেমন সুযোগ আছে সে সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি। সেই খোঁজ খবরে যে কাহিনী পেয়েছি তা তাজ্জব। পশ্চিম বাংলার মধ্যে কলকাতার রাজভবন থেকে পাঁচশ তিরিশ কিলোমিটার এলাকায় চটকলে বাঙালীদের ঢোকার কোনো উপায়ই যেন নেই অথচ মন্ত্রিসভা তো বাঙালীদের হাতে, রাজনৈতিক ক্ষমতা তো তাদেরই করায়ত্ত। এমন কি এখানকার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতাদের অধিকাংশই বাঙালী। তবু বরাহনগর থেকে নৈহাটির সতেরোটা চটকলের প্রায় দুলাখ শ্রমিকের চাকরিতে বাঙালী ঢুকতে পারবে না—এই ধরনের যেন একটা অলিখিত নিয়ম এখানে বিনা প্রতিরোধে, বিনা বাধায় বছরের পর বছর চলে আসছে। আর চটকল গুলোর আশে-পাশেই বিভিন্ন এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জে বেকার বাঙালী ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন হত্যে দিচ্ছে, লাঠি-ঝাঁটা খাচ্ছে। তবু চটকলগুলোতে ওদের কোনো কাজ জুটবে না।

চটশিল্প আজ ভারতের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা রোজগার করে। সারা ভারতে ৭৩টি চটকল আছে। তার মধ্যে পশ্চিমবাংলায় ৬১টি। সারা ভারতের চটকল শ্রমিকের মোটামুটি সংখ্যা হচ্ছে দু' লাখ ষাট হাজারের কিছু বেশি। তার মধ্যে পশ্চিম বাংলায় চটকল শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় দু' লাখ চল্লিশ হাজার। আগেই বলেছি, এর মধ্যে চল্লিশ হাজারের কিছু

বেশি কাজ করেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ হাওড়ার বজবজ থেকে উলুবেড়ের ১১টি কলে। বাকি শ্রমিকের অধিকাংশই আছেন উত্তরের বরাহ-নগর থেকে নৈহাটির বিভিন্ন কলে। এখানে শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় তু' লাখ। প্রায় সবাই অবাঙালী। এমন নয় যে, আগেকার দিনে অবাঙালীরা ঢুকেছিলেন বলে তাঁরাই এখনও আছেন। নতুন চাকরীতেও বাঙালীদের ঢোকবার কোনো উপায় নেই। এখানে যেন বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে বাঙালী বেকারদের বিরুদ্ধে। চটকলে বাঙালী মালিকানা নেই। প্রায় সবকটিরই মারোয়াড়ি মালিকানা। ঐ মালিকরা কোন শ্রমিক চাকরি পাবেন তা নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামান না। ও'রা শিল্পে শান্তি চান। এখানেই এসে যাচ্ছেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা।

বরাহনগর থেকে নৈহাটির চটকলগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিশ্লেষণ করলে যে তথ্য পাওয়া যাবে তা সত্যিই চাঞ্চল্যকর। এমনিতেই শ্রমিকরা অবাঙালী। এখানকার শ্রমিকরা প্রধানত বিহারী। তারপর উত্তরপ্রদেশের। কিছু মাদ্রাজী আর ওড়িয়াও আছেন। মিস্ত্রির কাজকর্ম করা অল্প কিছু বাঙালী অবশ্য আছেন। ও'রা ধর্তব্যের মধ্যেই নন। আসল কর্তা হচ্ছেন অবাঙালীরা। ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে কারখানাতে (ইংরেজিতে যাকে বলে প্ল্যাণ্ট বেসিসে) ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা হচ্ছেন বিহারী আর উত্তর প্রদেশী। এদের অধিকাংশই হাওয়া বুঝে দল বদল করেন। কংগ্রেসের সময় আই-এন-টি-ইউ-সি। এখন চলছে সিটুর দিন। এখানকার কোন আন্দোলন বা শ্রমিক বিক্ষোভে এ'রা এমনভাবে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্টদের জয়গান করতে থাকেন যে, তাতে মনে হতে পারে, বিহার আর উত্তরপ্রদেশে বুঝি মার্কসবাদীদের বিরাট প্রভাব। কিন্তু সবটাই ছলনা। এই কারখানার শ্রমিক নেতারা পশ্চিমবাঙলার শ্রমিক। দেশে ও'রা জোতদার, মিনি জমিদার। সম্মানীয় ব্যতিক্রম হয়তো আছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এখানে শ্রমিক, আপনা গাঁওমে মালিক। পশ্চিম বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনে ও'দের বিরাট আওয়াজ, বিরাট সমর্থন। দেশে গিয়ে কিন্তু সেখানকার ক্ষেত-মজুর আন্দোলনে প্রচণ্ড বিরোধীর ভূমিকাই ও'রা নিয়ে থাকেন। এ'রা পশ্চিমবঙ্গে শুধু শ্রমিকের রোজগারই করেন না। ও'রা

সুদে টাকাও খাটান। ধর্মঘট, লক-আউটের সময় মাসে শতকরা তিরিশ টাকা সুদে টাকা ধার দিয়ে থাকেন। অনেকেরই ছোটো মুদির দোকান পান-বিড়ির দোকান আছে। কারো কারো বস্তিও আছে। আছে আরো অনেক অসামাজিক কাজকর্ম্মের সঙ্গে সম্পর্কও। কিন্তু তাতেও বিশেষ কিছু ক্ষতি ছিল না। ওঁদের সবচেয়ে বড় অবদান হচছে ওঁরা চটকলে বাঙালি শ্রমিক ঢুকতে দেন না। বরাহনগর থেকে নৈহাটির দু'লাক্ষ চটকল শ্রমিকের চাকুরিতে কোনো নতুন লোক নিয়োগ করতে হলে বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে লোক আসবে। এই ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে লোক নিয়োগ করতে হবে। ব্যবস্থাও নানা ধরণের আছে। প্রথম স্তরে এই নেতাদের ভাই-ভাতিজারা চাকরি পেয়েছেন। তারপর অন্য শ্রমিকদের ভাই-ভাতিজাদের কাজ দিতে হবে। কাজ পেতে হলে অনেক নেতার সঙ্গেই মাসিক চুক্তি করতে হয়। কোথাও মাসে কুড়ি টাকা আবার কোথাও মাসে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত দিয়ে যেতে হবে। বিহারী উত্তরপ্রদেশের শ্রমিক কোনো প্রতিবাদ করেন না। কেননা তারা জানেন এটাই দস্তুর। এমনিভাবে ওঁদের বাপ দাদারাও এসেছিলেন। শুধু এতেই ঐ মৌরসি পাট্টার শেষ হলো না। এর পরে আছে সেই দেশে গিয়ে ক্ষেতি করার ছুটি আদায়। আগেই বলেছি,—চটকলের অনেক পাণ্ডা শ্রেণীর শ্রমিকের বিহার, উত্তরপ্রদেশে জমি আছে। ওঁরা পশ্চিম বাংলায় রোজগার করে এ রাজ্যের জন্য কোনো খরচ করতে চান না। ঐ রোজগারের একটা মোটা অংশ দেশে ক্ষেতিবাড়ির শ্রীবৃদ্ধি করে যান। চটকলের অনুমোদিত (ষ্ট্যাটুটরি) ছুটির সংখ্যা হচছে পনের দিন। ওর ওপর মালিকরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিনা মাইনেতে আরো এক মাস ছুটি দিয়ে থাকেন। এর ওপর ই-এস-আই-এর ব্যবস্থা আছে। তাই প্রতি বছর দলে দলে পাণ্ডা শ্রেণীর শ্রমিকরা ফেব্রুয়ারী থেকে ছুটি নিয়ে দেশে চলে যান। সেখানে ক্ষেতি-বাড়ি করেন। ফেরেন সেই জুলাই মাসে। চার পাঁচ মাস কামাই করলেও চাকরি যাবার ভয় নেই। সংঘবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন ত আছেই। কিন্তু পাঠককে জানানো দরকার যে, এই চার পাঁচ মাসেও কোনো বাঙালি বেকার এদের চটকলে ঢুকতে পারেন না। ছুটিতে যাবার আগে পাণ্ডারা দেশ থেকে নিজেদের লোক আনান। তাঁদের

বদলি হিসেবে ঢুকিয়ে যান। বদলি ঢোকানোর সময় অনেকের কিছু প্রাপ্তি যোগও ঘটে। কিন্তু বদলি শুধু কথার বদলি। ছুটির পর পাণ্ডারা ফিরে আসেন। বদলিদের পাকাপোক্তভাবে বসিয়ে দেওয়া নিয়ে তখন বাধে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ। তবে আজকাল সংঘর্ষ তেমন একটা হয় না। বদলি শ্রমিকরা স্থায়ী শ্রমিকই হয়ে যান। এমনিভাবে প্রতি বছর প্রতিটি চটকলে বদলি পাঁচ-ছশো শ্রমিক স্থায়ী শ্রমিক হচ্ছেন। এঁদের মধ্যে কোনো বাঙ্গালী ঢুকবেন না সে তো বলা বাহুল্য। প্রতিটি কলে গড়ে চার পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে, এক বছরে ওঁদের দেশে যাবার সময় যে চাকরি খালি হয় তা বাঙ্গালীরা পান না, পান ছুটি নিয়ে যাওয়া শ্রমিকদের দেশোয়ালিরা। বাঙ্গালী বেকাররা ভাবতেও পারেন না যে, পশ্চিম বাংলার চটকল শিল্পে তাঁদেরও দাবি আছে। অনেক সময় বোঝানোর চেষ্টা হয় যে, এই দাবি তোলায় প্রাদেশিকতার বদ-গন্ধ আছে। কিন্তু নিজের রাজ্যে কর্ম-সংস্থানের ক্ষেত্রে বঞ্চিত না হবার দাবিকে কি ঐ আখ্যা দেওয়া উচিত হবে?

কয়লা

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার স্যাণ্ড কোম্পানির রানীগঞ্জের কয়লাখনি সমূহ নিলামে উঠাল প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সেগুলি ৭০০০০ টাকায় কিনে নেন। কিন্তু কয়লা শিল্পে বাঙালীর এই অনুপ্রবেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরেও বাঙালীর ভূমিকা এই শিল্পে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কয়লা শিল্পের ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে বাঙালীর ভাগ্য জড়িত। কাজেই দেখা দরকার, এই শিল্পের হাল কী? স্বাধীনতার পর এই শিল্পের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে?

কয়লা শিল্পের আড়ত পূর্বভারত। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রয়েছে একটি বিশিষ্ট স্থান। আধুনিক শিল্পে কয়লার ব্যবহার ভারতে সবচেয়ে বেশি। কোথাও কোথাও বিদ্যুতের ব্যবহার আছে ঠিকই, কিন্তু বিদ্যুত তৈরির জন্যও চাই কয়লা। মূল জ্বালানী কয়লা আমাদের ঘরে থাকা সত্বেও এই রাজ্যের শিল্পের বিকাশ তেমন হয় নি। অন্যান্য শিল্পে বাঙালীর ক্রমিক পশ্চাদ-পসারণের বিবরণে অনেক কারণ উল্লিখিত হয়েছে। কয়লাশিল্পেও বাঙালীর ভাগ্যবিপর্যয় ঠেকিয়ে রাখা যায়নি।

অন্যান্য শিল্পের মতই কয়লাশিল্পেরও পত্তন ঘটেছিল ব্রিটিশ শাসনকালে ইংরেজদের হাতে। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত হাতে গোনা দু'চারটি কয়লা-খনির মালিক বাঙালীরা থাকলেও, এই শিল্পে ইংরেজদেরই ছিল আধিপত্য। স্বাধীনতার অব্যাবহিত পরে যখন হাত বদল হতে শুরু করল, তখন নগদ টাকার জোরে গোটা শিল্পটাই চলে গেল অবাঙালীদের হাতে। বাঙালীরা তাঁদের নিজেদের কয়লাখনিগুলিও ধরে রাখতে পারলেন না। এই পরিবর্তনের সাংঘাতিক পরিণতি ঘটলো দু'ভাবে। এক, যেহেতু স্বাধীনোত্তর ভারতে পশ্চিমবাংলার কয়লা শিল্পের মালিক হল অবাঙালীরা, সেইজন্যই তারা সারা ভারতে অর্থাৎ অন্যান্য রাজ্যে কয়লার দামে সর্বভারতীয় সমতা আনার দাবী করলেন। যুক্তি হিসাবে বলা হল, পশ্চিমবঙ্গ শিল্প সমৃদ্ধ। তার হাতে রয়েছে কয়লা এবং ঘরের কাছেই লৌহা ও ইস্পাত। কিন্তু গোটা ভারতে শিল্পোন্নতিতে সমতা আনা দরকার। না হলে দেশে অর্থ-নৈতিক বৈষম্য দেখা দেবে। কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিলেন। পশ্চিম-বঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও এই যুক্তির পক্ষে সায় দিলেন। তারপরই ১৯৫৬ সালে কয়লার দামে সমতা আনা হল। অর্থাৎ কয়লা পরিবহনের জন্য সে শুল্ক বসানো, যার ফলে দূরবর্তী স্থানে নীত কয়লার দাম বৃদ্ধি পায়, সেই পরিবহন শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকার ভরতুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ফলে, নিজের ঘরের কয়লা পশ্চিমবঙ্গর যে দামে কিনতে পায়, একই দামে গুজরাট বা কেরলও কয়লা কেনে। কয়লার সঙ্গে ১৯৫৬

সালেই লোহা ও ইস্পাতের দামেও সমতা আনা হল। স্থানগত সুবিধা পশ্চিমবাংলার আর রইল না। অন্যদিকে কম দামে কয়লা, লোহা ও ইস্পাত পেয়ে ও কেন্দ্রের অন্যান্য দাক্ষিণ্যের সুযোগে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং কিছু পরিমাণে দক্ষিণ ভারত শিল্পে এগিয়ে গেল গুণিতক হারে। আর পশ্চিমবাংলা পিছিয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় পরিনতি আরও মারাত্মক। এই অবাঙালী শিল্পপতিরা কয়লা খনি-গুলিকে ক্রমে ক্রমে দুর্দশার চরমে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে কয়লা খনিগুলিতে পরিচালনা ও অফিসের কাজে বাঙালীদের যে সংখ্যাধিক্য ছিল, তাও হ্রাস পেতে লাগল। নতুন মালিকরা কয়লা খনিগুলির আধুনিকীকরণ ও উন্নতি বিধানের জন্য যে পরিমাণ অর্থ লগ্নী করা দরকার ছিল, তা করেনি। সে টাকা অন্যান্য ফাটকা ব্যবসায়ে ঢেলেছে। ফলে, প্রতিটি কয়লাখনির অবস্থাই অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে। এরই সূত্র ধরে আসে শ্রমিক অসন্তোষ। ঘন ঘন ধর্মঘট আর মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন একেবারে চরম অবস্থায় ঠেলে দিল। এর থেকে শিল্পকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন কেন্দ্রীয় সরকার। গঠিত হল কয়লা নিয়ে সরকারী উদ্যোগ। তাতেও অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। বরং অন্যান্য সরকারী উদ্যোগের মতই কয়লা শিল্পও এখন লোকসানের কারবারে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবাংলার নিজস্ব এই খনিজ সম্পদের উপর পশ্চিমবাংলার ও বাঙালীর আর কোন অধিকার নেই।

কর্তৃত্ব না থাকুক, নিজের প্রয়োজন মত কয়লা পাওয়ার অধিকারটুকুও নেই। সেখানেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সরবরাহ ব্যবস্থা। রেলের ওয়াগনে কয়লা সরবরাহ করলে দাম কিছু কম পড়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন রেল দপ্তর থেকে কখনই সময়ে ও পর্যাপ্ত, ওয়াগন মেলে না। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য প্রদেশের জন্য ওয়াগনের বরাদ্দে যতটা তৎপর রেল দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ততটা উৎসাহ দেখা যায় না। এখানে অবাঙালী ব্যব-

সায়ীদের একটা সংগঠিত প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বাধ্য হয়েই অনেক সময় ট্রাকে করে কয়লা আনতে হয়। এতে খরচ পড়ে বেশি। আবার, ট্রাক ব্যবসাতেও অবাঙ্গালীরাই প্রধান। সেখানেও বাঙ্গালীদের পক্ষে বাধা বড় কম নয়।

দেশলাই

নিজের ঘরে আগুন লাগাতে হলেও বাঙালীকে দেশলাইয়ের জন্য অন্য রাজ্যে হাত পাততে হবে। এখন এই রাজ্যে যত দেশলাই মেলে, তার একটিও বাঙালীর তৈরী নয়। অর্ধেক বাংলায় তৈরি নয়। দেশলাই শিল্পে বাঙালীর অস্তিত্ব অনুসন্ধানে আমাকে বিস্তর পরিশ্রম করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকও কেউ নেই। অনেক চেষ্টার পর চারটি ইউনিটের সন্ধান পেয়েছি, যেগুলির মালিকানা বাঙালীর। কিন্তু এই সব ইউনিটের উৎপাদন অতি সামান্য। খাদি কমিশন সেগুলি কিনে নেয়। অতি বড় গণিতবিদের পক্ষেও হিসাবের খাতায় ওদের স্থান সঙ্কুলান করা মুশকিল।

স্বাধীনতার আগে অবস্থাটা অন্য রকম ছিল। তখন অবিভক্ত বাঙালার চাহিদার ৭০ শতাংশ যোগান দিত একটি বড় মাপের প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য আজও গোটা ভারতে বড় মাপের প্রতিষ্ঠান ওই একটিই। বাকি ৩০ শতাংশের যোগান দিত বাংলার ২২টি ছোট ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে ওই বাইশটি প্রতিষ্ঠানই মৃত্যুবরণ করল। নতুন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল না। এই শূন্যস্থান পূরণ করল দক্ষিণী দেশলাই। দক্ষিণী দেশলাই দামে শস্তা। ফলে বড় মাপের ওই প্রতিষ্ঠানটিরও বাজার গ্রাস করতে করতে এখনই অর্ধেক

দখল করে ফেলেছে। বর্তমানে এই রাজ্যে বছরে পাঁচ কোটি টাকার দেশলাই বিক্রি হয়। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ দক্ষিণী দেশলাই। বাকিটা সেই বড় মাপের প্রতিষ্ঠানের দখলে।

দেশলাই শিল্পে বাঙালী নেই। একটিমাত্র বড় প্রতিষ্ঠান। দুনিয়াজুড়ে ওদের এই শিল্প ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প ভিত্তিতে দেশলাই শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটল স্বাধীনতার পর। পশ্চিম বাংলার প্রসার তো দূরের কথা, শিল্পটাই উঠে গেল। এর কারণ কি ?

আসলে শিবকাশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটে গেল বাঙালীরা। প্রথম কারণ কাঁচা মাল—দেশলাই কাঠির কাঠ, মশলার কেমিক্যালস, বাকসের কাঠ ইত্যাদি সবই দক্ষিণ ভারতে সুলভ। ফলে কাঁচামাল আনতে শিবকাশীর তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে খরচ পড়ে বেশি। দ্বিতীয় কারণ, শিবকাশী ও অন্য জায়গার চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক বিরোধও বেশি। তৃতীয়ত, রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। এইসব কারণে পশ্চিম বাংলায় তৈরি দেশলাইয়ের খরচ পড়ে বেশি। কম দামে শিবকাশীর দেশলাই পেলে, বেশি দাম দিয়ে বাংলার দেশলাই কোন বাঙালীও কিনবে না। এটাই তো স্বাভাবিক।

তামিলনাড়ু, অন্ধ্র ও কেরল যে কম দামে দেশলাই দিতে পারে, তার কারণ সেই সেই রাজ্যের সরকার এই শিল্পের জন্য নানা রকম সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে, মশলা তৈরির একটি বড় উপকরণ পটাশিয়াম ক্লোরাইড। তামিলনাড়ু সরকার ভরতুকি দেওয়ায় ওই রাজ্যে পটাশিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায় কিলো প্রতি চার টাকা দরে। অথচ রাজ্য সরকার কোন ভরতুকির ব্যবস্থা না করায় এই রাজ্যে ওই পটাশিয়াম ক্লোরাইডের দাম কিলো প্রতি আট টাকা পঁচিশ পয়সা। অন্য রাজ্যে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্যের উপর বিক্রয় কর নেই। এই রাজ্যে আছে —শতকরা ছ' টাকা হারে। এই শিল্পে বিশেষ এক ধরণের মোমতেল দরকার।

সেটাও অন্য রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়। এই রাজ্যে এই তেল পাওয়া যায় খুবই কম। কাজেই যে দু'চারজন দেশলাই বানাচ্ছেন, তাঁদের কিলো প্রতি এক টাকা ষাট পয়সা দরে ওই তেল কিনতে হয় কালোবাজারে তিন গুণ দামে।

কাচ

কাচ শিল্পে বাঙালী নিশ্চিহ্ন। সর্বশেষ বাঙালী প্রতিষ্ঠানটির অন্ত্যেষ্টি সুসম্পন্ন হয়েছে কিছুদিন আগে। পরে রাজ্য সরকার সেটি অধিগ্রহণ করে মৃত সঞ্জীবনী সুধা ঢেলে চাঙ্গা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন কাচ শিল্প মালিকদের সংস্থার নামের তালিকায় কোন বাঙালীর নাম নেই। এই হিসাবের বাইরে যদি কোন বাঙালী প্রতিষ্ঠান বেঁচেবর্তে থাকেও, সামগ্রিক বিচারে তা অনুল্লেখ্য। অ্যাম্পুল তৈরির যে হাজার দু'য়েক কুটির শিল্প সংস্থা আছে, তার বেশির ভাগ মালিক বাঙালী। কিন্তু সেখানেও এখন শতকরা ৯০টি কারখানায় তালা ঝুলছে।

অথচ এক সময় ভারতে বাঙালীরাই ছিল কাচ শিল্পে অগ্রগণ্য। ভারতের প্রথম কাচ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল টিটাগড়ে বাঙালীর উদ্যোগে এই শতকের গোড়ার দিকে। এখন তা ইতিহাসের তথ্য মাত্র। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় এই শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত বাংলায় মোট ৪৭টি কাচ শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। এখন এর সংখ্যা কমে হয়েছে মাত্র উনিশটি। স্বাধীনতার আগে বাঙালীরা ছিল ৪২টি প্রতিষ্ঠানের মালিক। এখন নেই একজনও। স্বাধীনতার আগে এই শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের শতকরা

৫০ ভাগ ছিল অবাঙালী। এরা বেশির ভাগই বিহার ও উত্তর প্রদেশের লোক। এখন এই সংখ্যাটা আরও বেড়েছে। এখন অবাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৭৫ ভাগ।

দেশ বিভাগের পর থেকেই এই শিল্পে বাঙালীর ভাগ্য বিপর্যয় শুরু। পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে কলকাতায় উৎপন্ন কাচ সামগ্রীর বড় বাজার ছিল পূর্ব বাংলা। দেশ বিভাগের পর সেই বাজার হাতছাড়া হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর অন্য অন্য রাজ্যে এই শিল্প সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। ফলে, পশ্চিমবঙ্গ তার হারানো বাজার ভারতের অন্যত্র খুঁজে পায় নি। অন্য দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর থেকে এই শিল্পের কারিগরি দিক থেকে গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। আগে কাচ নির্মাণ করা হত বালি থেকে সনাতনী প্রথায়। পরে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করা হতে থাকে। এর জন্য যন্ত্র কেনা, আরও অর্থ বিনিয়োগ করা—কোনটাই বাঙালী করে উঠতে পারে নি। যাঁরা পেরেছিল, তাঁরাও শেষ রক্ষা করতে পারে নি। ব্যয় বৃদ্ধি, বাজারের অভাব ও শ্রমিক বিরোধের দরুন।

এই শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। সোডাঅ্যাশ আনতে হয় সৌরাষ্ট্র থেকে, সিলিকা বালি আসে এলাহাবাদ থেকে, ডোলোমাইট ও লাইমষ্টোন আনা হয় দেরাদুন ও মধ্যপ্রদেশ থেকে। স্বাধীনতার পর ট্রেনের মাশুল হু হু করে বেড়েছে। কাঁচামালের দামও বেড়েছে। কয়লা হাতের কাছে থাকা সত্বেও ওয়াগন মেলেনি। ৫০ শতাংশ কয়লা আনতে হয় সড়ক পথে লরি ট্রাকে করে। খরচ পড়ে দ্বিগুণ। এর সঙ্গে আছে শ্রমিক বিরোধ ও সাম্প্রতিক লোড শেডিং। এত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে কেবল বাঙালী নয়, কেউই পেরে ওঠে নি। বাঙালীরা একেবারেই পারল না। অবাঙালীরা অন্য রাজ্যের সরকারী সহায়তায় অন্যত্র নতুন নতুন কারখানা বা পুরনো কারখানার নতুন ইউনিট খুলেছেন। তাই অবাঙালীরা টিঁকে আছে, তাও সংখ্যায় কম। বাঙালীরা একেবারেই নেই।

এই শিল্পের প্রসার না হওয়ার আরও একটি গুরুতর কারণ আছে। এই শিল্পের একটি বড় অংশ হল নানা রকমের শিশি বোতল তৈরি করা। শিশি বোতল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ভেষজ শিল্পে। স্বাধীনতার পর এই রাজ্যে ভেষজ শিল্পের প্রসার তো ঘটেই নি, বরং অন্যান্য শিল্পের মত এই শিল্পও এখানে ক্ষয়িষ্ণু। অন্য দিকে, এই সময়ের মধ্যে ভেষজ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে। এমন কি, বিদেশী ভেষজ শিল্প সংস্থাগুলিও তাঁদের বেশির ভাগ কারখানা খুলেছে বোম্বাইতে। ফলে, পশ্চিম বাংলায় কাচ শিল্পর প্রসারের সম্ভাবনাও গোড়া থেকেই রুদ্ধ। স্বাধীনতার পর অন্য রাজ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই শিল্প সম্পর্কে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ভাল ব্যবস্থা করেছেন। এই রাজ্যে তা এখনও হয় নি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও একদা কাচ শিল্পে স্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ডি, এন, সেনের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় একটি গ্লাস ও সিরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট গঠিত হয়েছিল যাদবপুরে। দুর্গাপুরে একটি আছে। কিন্তু দু'টির কোনটারই অবস্থা ভাল নয়। যাদবপুরের প্রতিষ্ঠানটিকে বরোদায় নিয়ে যাওয়ার কেন্দ্রীয় প্রয়াসের এখনও বিরাম নেই।

যন্ত্র নির্ভর সংগঠিত শিল্পের বাইরে আছে গোটা রাজ্যে কুটির শিল্প প্রতিম অ্যাম্পুল তৈরির দু' হাজার প্রতিষ্ঠান। এইসব প্রতিষ্ঠানে অ্যাম্পুল তৈরি হয় এখনও সনাতনী প্রথায়—মাউথ ব্লোয়ার পদ্ধতিতে। এতে উৎপাদন কম, ব্যয় বেশি। এদিকে হাওড়ায় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেখানে অ্যাম্পুল তৈরি হয়েছে আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। উৎপাদন বেশি, ব্যয় কম। বলা বাহুল্য, এই প্রতিষ্ঠানটিও অবাঙালীর। এবং এই একটি প্রতিষ্ঠানের ধাক্কাতেই বাঙালীদের অ্যাম্পুল তৈরির ছোট ছোট সংস্থার বেশির ভাগেরই ঝাঁপ বন্ধ। অমন যে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস কোম্পানি, তারও নাভিশ্বাস উঠেছে। এখন এটি কৃষ্ণা গ্লাসের মতই সরকারী অধিগ্রহণের অপেক্ষায় রয়েছে।

এখন এই বাংলায় জানলার কাচ, বীয়ারের বোতল, ওষুধের শিশি, জলের গেলাস —সবই তৈরি করছেন অবাঙালীরা, এই বাংলায় বসে। কাচ শিল্পে বাঙালীর ভরাডুবি হয়েছে।

হোসিয়ারি

প্রতিদিন এই বাংলায় ১৮ হাজার বাঙালী শ্রমিক ৬৫ হাজার গেঞ্জি তৈরী করেন। কিন্তু এগুলির মালিক অবাঙালীরা। হোসিয়ারি শিল্পে বাঙালীর হালফিল অবস্থাটা এই ছবি থেকে এক নজরে আঁচ করা যাবে। বোনাই বা ধোলাই যন্ত্রের মালিক হিসাবে কিছু বাঙালীর নাম আছে, কিন্তু শিল্পের প্রাণভোমরাটি অবাঙালী ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়ে পড়েছে। আটাত্তরের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটের পর এই শিল্পে বাঙালী শ্রমিকদের একচেটিয়া প্রাধান্যেও ভাঁটার টান লেগেছে।

বোনাই ধোলাই ও সেলাই—এই তিন অংশ নিয়ে হোসিয়ারি শিল্পের একটি সংহত রূপ। এইরকম সংহত শিল্প ইউনিট আছে এখন এই রাজ্যে মাত্র পাঁচটি। এর মধ্যে তিনটির মালিকানা বাঙালীদের, বাকি দু'টি অবাঙালীদের হাতে। এছাড়া ২ হাজার ইউনিটের সবগুলিই আলাদা আলাদা ইউনিট। বোনাই ইউনিট আছে ৬০০টি, ধোলাই ইউনিট ১০০টি, সেলাই ইউনিট হাজারটি আর আছে ঠিকাদারদের ইউনিট ৩০০টি। বোনাই ইউনিটের শতকরা ৮০ ভাগ মালিক বাঙালী। এখানে সুতো থেকে গেঞ্জি মোজার থান তৈরি করা হয়। আসলে এখন বোনাই ইউনিটের মালিকরা বোনাই মেশিনের মালিক মাত্র। এঁদের প্রায় ৯০ শতাংশই নিজেরা সুতো কিনে থান তৈরী করতে পারেন না। সুতো কেনার মত সঙ্গতি নেই। সুতোর যোগান দেন বড়বাজারের অবাঙালী ব্যবসায়ীরা। এঁরা ফুরণে কাজ করে দেন।

ধোলাই ইউনিটের ক্ষেত্রেও তাই। অবাঙালী ব্যবসায়ীরা সুতো সরবরাহ করে বোনাই ইউনিট থেকে থান করিয়ে নিয়ে তা ধোলাই করিয়ে নেন

ফুরণে। এরপর সেলাই। সেলাই ইউনিট আছে ১ হাজারের মত। এগুলিরও বেশির ভাগ মালিকানা অবাঙালীদের হাতে। সেলাই হয়ে যাওয়ার পর নিজের নিজের কোম্পানির লেবেল এঁটে তা বাজারে ছাড়া হয় বিক্রির জন্য। প্রায় তিনশ ঠিকাদার ইউনিট আছে, যার সবাই অবাঙালী। এঁদের কিছুই নেই। না বোনাই মেশিন, না ধোলাই মেশিন, না সেলাই মেশিন। এঁরা সব জায়গায় ঠিকা কাজ করিয়ে নিয়ে তারপর নিজের নিজের কোম্পানির লেবেল এঁটে বাজারে বিক্রি করেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে কিছু মেশিনের মালিকানা ছাড়া বাঙালীদের হাতে এই শিল্পের আর কিছুই নেই। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করার ব্যাপারটা প্রায় ৯৫ শতাংশই অবাঙালীদের হাতে। কার্যত, এই শিল্প বাঙালীদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। বাঙালীরা যন্ত্রের মালিক হয়েও ঠিকা শ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

এই শিল্পে এখনও বাঙালী শ্রমিকরাই গরিষ্ঠ। কিন্তু আটাত্তর সালের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটের পর থেকে বাঙালী শ্রমিকদের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে গোটা পশ্চিমবাংলায় মোট শ্রমিক আছেন ২২ হাজার। তার মধ্যে ১৮ হাজার বাঙালী। ৪ হাজার অবাঙালী। অবাঙালীরা সকলেই বিহারী। এই ধর্মঘটের ফলে বোনাই ও ধোলাই মেশিনের বাঙালী মালিকরা বাঙালী শ্রমিক নিয়োগে তেমন উৎসাহ বোধ করছেন না। সেই সুযোগে গত ২ বছরে ৪ হাজার অবাঙালী শ্রমিকের চাকরি হয়েছে এই শিল্পে। ওই ধর্মঘটের ফলে আরও কিছু মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। দীর্ঘদিন উৎপাদন বন্ধ থাকার সুযোগে তামিলনাড়ুর তিরুপুর ও উত্তরপ্রদেশের বারানসী এই রাজ্যের বাজারে একটা বড় হিস্যা দখল করে নিয়েছে। ধর্মঘট মিটে যাওয়ার পরেও দখলদারদের জায়গা ছাড়তে হয়নি। কারণ, দক্ষিণী ও বারানসী গেঞ্জি মোজার দাম এই রাজ্যের তুলনায় কম। এই ধর্মঘটের ফলে বাঙালী ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গিয়েছে, সুতোর দাম সাংঘাতিক বৃদ্ধি পেয়েছে তাছাড়া শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, টাকা থাকলেও কেউ আর

নতুন বিনিয়োগে উৎসাহী নন। সেই জায়গাটা পূরণ করছেন অবাঙালী ব্যবসায়ীরা। এঁদের প্রায় সকলেই মাড়োয়ারি, কিছু আছেন পাঞ্জাবী ও গুজরাটী। এরাই সুতোর যোগান দিচ্ছেন, এরাই তৈরী মাল বাজারে বিক্রি করছেন। দু-চারজন বাঙালীকে বাদ দিলে হোসিয়ারি শিল্প এখন অবাঙালীদের কব্জায়। বাঙালীরা এখন অধিকাংশই কেবল বোনাই মেশিন বা ধোলাই মেশিনের মালিক মাত্র। গোটা শিল্পে মালিকের ভূমিকায় নেই।

অথচ কুড়ি বছর আগেও এই চেহারা অন্যরকম ছিল। তখন সারা ভারতের চাহিদার ৮০ শতাংশ পূরণ করত এই বাংলা। এখন সারা ভারতের চাহিদার ক্ষেত্রে এই রাজ্যের উৎপাদন মাত্র ৩৫ শতাংশ এবং বলাই বাহুল্য, এখন যা উৎপন্ন হচ্ছে তারও সবটাই নিয়ন্ত্রণ করছে অবাঙালী ব্যবসায়ীরা। বাঙালী একেবারে নেই, অঙ্কের হিসাবে তা বলা যাবে না। ধরুন, গেঞ্জি তৈরীর কথাই। আসলে দৈনিক গেঞ্জি তৈরি হয় ৭০ হাজার। এরমধ্যে মাত্র ৫ হাজার গেঞ্জির মালিক বাঙালী—যাঁরা নিজেরাই গেঞ্জি তৈরি করা থেকে বিক্রি করা পর্য্যন্ত সবটাই নিয়ন্ত্রণ করেন। বাকি ৬৫ হাজার গেঞ্জির মালিক অবাঙালীরা। সে কথা আগেই বলেছি।

হোসিয়ারি শিল্পে বাঙালীর এই পিছিয়ে পড়া নিশ্চয়ই উদ্বেগের। কিন্তু এই রাজ্যের পক্ষে আরও বেশি উদ্বেগের কথা হল, গোটা শিল্পটাই আজ ধ্বংসের মুখে। তার কারণ, অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবাংলা প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে। কাঁচা মাল হিসাবে সুতো আমদানি করতে হয় অন্য রাজ্য থেকে। শতকরা ৭০ ভাগ সুতো আসে দক্ষিণ ভারত থেকে। স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায় কয়লার দামে সমতা রক্ষার নীতি ভুলো বা সুতোর ক্ষেত্রে করে যাননি। ফলে, পশ্চিমবঙ্গকে অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশি দামে সুতো কিনতে হচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ, ধোলাই খরচও এখানে বেশি। এক কিলোগ্রাম গেঞ্জি আজকাল ধোলাই করতে তামিলনাড়ুর তিরুপুরে খরচ পড়ে দেড় টাকা, এই রাজ্যে খরচ পড়ে সাড়ে তিন টাকা। তৃতীয় কারণ, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে

শ্রমিকদের মজুরী পড়ে বেশি। এইসব কারণে, অন্যান্য রাজ্যে উৎপন্ন গেঞ্জি, মোজার দাম এই রাজ্যের চেয়ে কম হওয়ায় সারা ভারতে তো বটেই, নিজের রাজ্যের বাজারও পশ্চিমবঙ্গের হাতছাড়া হওয়ার মুখে। শিল্পে ক্ষতি হলে ক্ষতি এই রাজ্যের, রাজ্যের অধিবাসীদের।

সাবান

হিমানী সাবান কোম্পানির মালিক মিঃ ব্যানার্জি এখন ওই কোম্পানিরই বেতনভুক কর্মচারী। নতুন মালিক মিঃ আগরওয়ালা। এই ঘটনাটি নজির হিসাবে উল্লেখ করলাম যা থেকে বোঝা যাবে সাবান শিল্পে এই রাজ্যে বাঙালীর হালফিল অবস্থাটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। বোম্বাইওয়ালাদের দাপটে বাঙালী পর্যুদস্ত। ক্ষুদ্রশিল্পে যারা কোনমতে বেঁচেবর্তে ছিল বা এখনও আছে কেউ কেউ তারাও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ক্ষয়রোগে ভুগছে। মোট কথা সাবান শিল্পেও বাঙালী ধুয়ে মুছে সাফ হওয়ার মুখে।

অন্যান্য অনেক শিল্পের মত সাবান শিল্পে ইউনিটের সংখ্যা কমেনি। আসলে যা হয়েছে, তা হল এই শিল্পে ব্যাপক হাতবদল হয়েছে। এখন ছোট মাপের অর্থাৎ ক্ষুদ্রশিল্পে মোট ইউনিট আছে ৪৫০। এর মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ সংস্থার মালিকানা অবাঙালীর হাতে। অথচ স্বাধীনতার আগে এই সংখ্যাটি ছিল নগন্য। বড় মাপের সংস্থা আছে আটটি। এর মধ্যে মাত্র দু'টি বাঙালীর। গুঁড়ো সাবানের সংস্থা আছে প্রায় ৩০টি। এর মধ্যেও প্রায় কুড়িটির মালিক অবাঙালী। এই শিল্পে ছোট বড় সবরকম ইউনিটে কর্মীর সংখ্যা প্রায় ২০

হাজার এরমধ্যে শতকরা ৬০ জন কর্মীই অবাঙালী। গত দশ বছরের হিসাবের খাতা দেখলে বোঝা যাবে অবাঙালী মালিকের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে অবাঙালী কর্মীর সংখ্যাও।

দু'টি বাঙালী প্রতিষ্ঠান—বেঙ্গল কেমিকেল ও ক্যালকাটা কেমিকেলের গায়েমাখা সাবান তৈরিতে সুনাম আছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার বাজারে এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের সাবান বিক্রির পরিমাণ মাত্র ১৫ শতাংশ। বাকি ৮৫ শতাংশ বাজার বোম্বাই ও টাটার দখলে। বোম্বাইওয়ালারা ও টাটা কোম্পানি এই বাঙলায় যেভাবে বাজার দখল করেছে, বাঙালী প্রতিষ্ঠান দু'টি সে তুলনায় বিশাল ভারতের কোথাও তেমন বাজার পায়নি। গুঁড়ো সাবানে তো বোম্বাই ও টাটা পশ্চিমবাঙলা ছেয়ে ফেলেছে। গুঁড়ো সাবান তৈরির জন্য কয়েক বছর আগে ৬৫ জন আবেদনকারীকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে টিঁকে আছে মাত্র ৩০টি প্রতিষ্ঠান। এরমধ্যে বাঙালী প্রতিষ্ঠান গোটা দশেক মাত্র। বোম্বাই ও টাটার সঙ্গে বাঙালীরা প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত।

বাঙালীর এই পিছু হটার প্রধান কারণ, পুঁজির অভাব। আর রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। বড়ো মাপের শিল্পে বোম্বাই ও টাটা যত বড় করে এই শিল্পের পত্তন করেছে, বাঙালীরা তা পারেনি। তাছাড়া স্বাধীনতার পর অন্য রাজ্যের সরকার নানাভাবে সহযোগিতা করে যেভাবে এই শিল্পের প্রসার ঘটিয়েছে পশ্চিমবাঙলায় সেরকম কিছু ঘটেনি। বরং অন্য অন্য রাজ্যে সাবানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় পশ্চিমবাঙলার বাজার সঙ্কুচিত হয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমবাঙলায় এই শিল্পের তেমন প্রসার না ঘটায় বোম্বাই ও টাটার বাজার এই রাজ্যে ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

এই শিল্পের জন্য কাঁচামাল সবই আমদানি করতে হয় অন্য রাজ্য থেকে। বিদেশ থেকে আনা ভেড়ার চর্বি বাদ দিলে সাবান প্রস্তুতের জন্য অন্যান্য তেল বেশির ভাগই আসে গুজরাট থেকে। গুজরাট থেকে বোম্বাই কাছে। পরিবহন

খরচ কম পড়ে। কিন্তু পশ্চিমবাঙলার ক্ষেত্রে এই খরচ তিনগুণ বেশি। কয়লার দামে সমতার নীতি অনুযায়ী এ ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে পশ্চিমবাঙলা কোন ভরতুকি পায় না। কষ্টিক সোডাও আসে ভিন্ন রাজ্য থেকে। সেখানেও এই একই ব্যাপার। কাজেই বোম্বাই যে সুবিধা পায়, পশ্চিম বাঙলা তা পায় না।

তবু বড় মাপে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পারলে এসব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু, বাঙালীরা বড় মাপের প্রতিষ্ঠান গড়তে পারেনি পুঁজির অভাবে। বাকি রইল ক্ষুদ্রশিল্প। এক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার দরকার ছিল। তা হয়নি। বরং উল্টোটাই হয়েছে। বিদেশ থেকে আমদানি করা ভেড়ার চর্বি বরাদ্দ হয়ে থাকে এই রাজ্যের জন্য। ৩০০০ টন। সরকার এই পরিমাণ চর্বি আগে বিতরণ করতেন ৩৩০টি প্রতিষ্ঠানে। এখন তা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ৮০টিতে। এর কারণ চর্বির দাম অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে এই রাজ্যে বেশি। তাছাড়া, কনট্রাকটারের হাত ঘুরে আসা চর্বিতে ভেজালের পরিমাণই বেশি। আমদানি করা কস্টিক সোডা সরকার বিক্রি করেন টন পিছু ৭২০০ টাকা করে। কে কিনবে? কালো বাজারে দেশী কস্টিক সোডার দামই তো টন প্রতি ৫৫০০ টাকা। এই শিল্পকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, কাঁচা মাল কেনায় ৮ শতাংশ হারে পারচেজ ট্যাকস বসিয়ে রাজ্য সরকার এক মোক্ষম ধাক্কা দিয়েছেন।

এই অবস্থায় সাবান শিল্পের ইউনিটগুলি বাঙালীদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সস্তা দরে কিনে নিয়ে অবাঙালীরা আরও টাকা বিনিয়োগ করে ক্ষুদ্রশিল্পকে মাঝারি বা বড় মাপের শিল্পে উন্নীত করে দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বাঙালীরা যে সেইসব প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী হয়ে জীবন কাটাবে তারও উপায় নেই, অবাঙালী মালিকরা অবাঙালী কর্মচারীই বেশী পছন্দ করে।

চর্ম

আপনি যে চপ্পলটি পায়ে গলিয়ে অফিসে যান, আপনার ছেলে যে জুতো পরে স্কুলে যায়, আপনার গিন্নির হাতে যে সুদৃশ্য ভ্যানিটি ব্যাগটি নিত্য সহচরী, বেড়াতে যাওয়ার সময় কুলির মাথায় আপনার যে সুটকেসটি শোভা পায়—এর কোনটিই হয়ত এই বাংলায় তৈরি নয়, বাঙালীর তৈরী নয়। 'হয়ত' বললাম এই জন্য যে, এসব বাঙালীরা একেবারেই তৈরি করে না এমন নয়, কিন্তু তা সংখ্যায় অতি সামান্য। স্বাধীনতার পরেও, মাত্র দু' দশক আগে এই শিল্পে ভারতে বাঙালীরাই ছিল শীর্ষে, আর এখন ৯০ শতাংশই বাঙালীর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

এশিয়ার মধ্যে প্রথম এই বাংলাতেই চর্মশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল। একসময় সারা ভারতে ১০ জন চর্মশিল্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চাকুরিজীবীর মধ্যে নয়জনই ছিল বাঙালী। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। এখন প্রতি ১০জনে মাত্র ১জন বাঙালী। এর কারণ, স্বাধীনতার পর অন্য রাজ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উচ্চতর ....শিক্ষা ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দানের ব্যবস্থা অনেকদিন চালু হয়েছে। কিন্তু, এই রাজ্যের সেই প্রাচীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে আজও স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়নি। একসময় কলকাতা ছিল সারা ভারতে কাঁচা চামড়ার একমাত্র বাজার। কয়েক বছর হল, সেই বাজারটি বাঙালীর হাতছাড়া হয়েছে। চুঙ্গিকর, কাঁচা মালের উপর কর ধার্যের ফলে এখন কাঁচা চামড়া সরাসরি উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত ও আরব সাগর তীরের বোম্বাই রাজ্যে চলে যাচ্ছে। হাতের কাছে কাঁচা চামড়া পাওয়ার সুযোগ থেকে এই রাজ্য বঞ্চিত হল।

পশ্চিমবঙ্গে জুতো ও চপ্পলের মত চাহিদা তার ৪০ শতাংশ সরবরাহ করে বাটা কোম্পানি। এর বাইরে বাকি ৬০ শতাংশের মধ্যে মাত্র ১৫ শতাংশের যোগান দেয়

চীনা ব্যবসায়ীরা। বাকি সবটাই আসে উত্তর ভারত, বিশেষ করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। বাংলায় বাঙালীর হাতে তৈরি পণ্যের পরিমাণ যৎসামান্য। অন্যান্য চর্মশিল্পের ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা। কেবল, দস্তানার চাহিদার ৫০ ভাগ পূরণ হয় এই রাজ্য থেকেই। দস্তানা তৈরিতে নিযুক্ত কারিগরদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা ৬০ শতাংশ হলেও, এইসব শিল্প ইউনিটের মালিকানার অর্ধেকই কিন্তু অবাঙালীদের হাতে। এরা কোথাও সরাসরি মালিক, কোথাও টাকার যোগানদার।

প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ লোক এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। এর মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশই অবাঙালী। প্রায় ৭০ শতাংশের আর্থিক অবস্থা সরকারী পরিভাষায় দারিদ্র্যসীমার নীচে। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের ছাগলের চামড়া নাকি। বিশ্বের বাজারে সেরা। এই ধরনের চামড়া বিদেশে রফতানি হয়ে থাকে। বড় ক্রেতা রাশিয়া। কিন্তু রফতানির সূত্রে লাভের কড়ির বড় হিস্যা যায় অবাঙালীর পকেটেই। এই পশ্চিমবঙ্গেই চামড়া রফতানির ব্যবসায় নিযুক্ত আছেন প্রায় ৩০ জন। এর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা মাত্র ৪ জন।

পশ্চিমবঙ্গে এখন ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় ৩০০ ট্যানারি আছে। এর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা মাত্র ৩০টি। এইসব ট্যানারিতে কারিগর আছে প্রায় ৩০ হাজার। এর মধ্যে বাঙালী কারিগরের সংখ্যা অর্ধেক। বড় মাপের যে ৩০টি ট্যানারি আছে, তার মধ্যে মাত্র ৩টি বাঙালীর। কলকাতা ও তার আশেপাশে আছে চীনাদের জুতো তৈরির প্রায় ১২০টি ইউনিট। এইসব ইউনিটে তৈরি জুতোর দাম স্বাভাবিকভাবেই কম। বাঙালীরা এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হার স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে।

এই শিল্পে বড় রকমের ঘা মেরেছে নরম প্লাসটিক ও রবারের তৈরি জুতো ও চপ্পল। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের জুতো ও চপ্পলের চাহিদা ক্রম-বর্ধমান। কিন্তু বাঙালীরা এই ব্যবসাও শুরু করতে পারছে না। তার কারণ,

এর জন্য যে টাকা লগ্নী করা দরকার, বাঙালীর তা নেই। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাওয়াও দুস্কর। এই সুযোগটাও বরং বেশি করে নিচ্ছে অবাঙালীরা।

মুদ্রণ

মুদ্রণ শিল্পে বাঙালীর ভাগ্য এখন রাহুগ্রস্ত। দু' বছর আগেও এই বাংলায় যে পরিমাণ কাজ হত, এখন তার ৬০ শতাংশই চলে গিয়েছে অন্য রাজ্যে। যেটুকু কাজ বাকি রইল, তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে অব্যাহত লোডশেডিং ও লাগাতার শ্রমিক বিরোধ। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে অবাঙালীরা এই শিল্পেও নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে চলেছে। নীট ফল: বাঙালী কোণঠাসা। মুদ্রণের কাজ বাঙলা থেকে অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অনেকদিন ধরেই চলছে। তার কারণ, কলকাতায় যত বেসরকারী বাণিজ্য ও প্রতিষ্ঠান আছে তার কর্তারা অনেকেই অবাঙালী। অন্য রাজ্য থেকে ছাপার কাজ করিয়ে আনায় তাঁরা বরাবরই উৎসাহী। অজুহাত, শ্রম বিরোধ। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরের সেই দীর্ঘমেয়াদী ধর্মঘট তাঁদের আরও বেশি করে সুযোগ এনে দিল। ওই ধর্মঘটের সময় প্রায় ৭০ শতাংশ কাজ চলে যায় বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর ও শিবকাশীতে। ধর্মঘট মিটে গিয়েছে অনেকদিন। কিন্তু সেই কাজের প্রায় ৬০ শতাংশই আর ফিরে আসেনি।

ভোগ্যপণ্য নির্মাতা সংস্থাগুলির বেশির ভাগেরই সদর দপ্তর ও প্রচার বিভাগ কলকাতা থেকে বোম্বাই ও দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। সেইসব সংস্থার যাবতীয় কাজ এখন বোম্বাই ও দিল্লিতে হচ্ছে। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে,

সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতাতেও বাংলা পেরে উঠছে না। মুদ্রণ ব্যয় এক বোম্বাই বাদ দিলে আর সব জায়গাতেই কলকাতার চেয়ে কম। শিবকাশীতে ছাপার ব্যয় এতই কম যে, গাড়ি ভাড়া খরচ করেও শিবকাশীতে ছাপালে কলকাতার চেয়ে খরচ কম পড়ে। লক্ষ লক্ষ কপি ছাপার কাজ, সে ছাপায় মুদ্রণ পরিপাট্যের বালাই নেই এবং লাভ বেশি, সেইসব কাজ এখন সবই শিবকাশীতে হচ্ছে। সুমুদ্রণের যে গৌরব একদা বাংলার একচেটিয়া ছিল, বাঙালীরা এখন সেখানেও মার খাচ্ছে। শ্রীস্বরস্বতী প্রেস শ্রমিক বিরোধের দরুণ দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। অন্যদিকে স্বাধীনতার পর থেকে বোম্বাই ও দিল্লিতে মুদ্রণ শিল্পে ব্যাপক আধুনিকীকরণ ঘটেছে। ফলে, সুমুদ্রণের জন্যও এখন কাউকে আর অনন্যোপায় হয়ে কলকাতায় আসতে হয় না। নেপাল থেকে আগে যে অর্ডার আসত কলকাতায়, এখন তা যাচ্ছে দিল্লিতে।

বাঙালী প্রেস মালিকরা অবশ্য স্বীকার করলেন যে, লেবার ট্রাবলের অভিযোগটি সত্য। একসময় প্রেসে প্রেসে শ্রমিক হাঙ্গামা নিত্যদিনের ঘটনা ছিল। এর ফলে, সময়মত মাল ডেলিভারি দেওয়া যেত না। কিন্তু এখন, শ্রমিক বিরোধ অল্পস্বল্প থাকলেও, আসল হাঙ্গামা কিন্তু লোডশেডিং নিয়ে। একটি প্রেসে দিনে দুটি শিফটে মোট ১৬ ঘণ্টার মধ্যে গড়ে সাত ঘণ্টা বিদ্যুৎ বন্ধ। অথচ এই সাত ঘণ্টার জন্য মালিককে মজুরী দিতেই হয়। একদিকে কাজ কমেছে, অন্যদিকে লোডশেডিংয়ের জন্য গুণাগার দিতে হচ্ছে। তার উপর শ্রমিকদের বর্ধিত বেতন ও ব্যবহৃত জিনিষের দাম বৃদ্ধির ফলে মোট খরচের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ। এই ধাক্কা সামলানোর ক্ষমতা বহু প্রেসের নেই। ধর্মঘটের পর গত দেড় বছরে বহু প্রেস বিক্রি হয়ে গিয়েছে কেবল টাকার অভাবে, কাজের অভাবে। এই প্রেসগুলি কিনছেন অবাঙালীরা। এখন পশ্চিমবাঙলায় প্রেস আছে ছয় হাজার। এর মধ্যেই প্রায় ৭০০ প্রেস অবাঙালীর। অথচ দু' বছর আগে এর সংখ্যা ছিল নগণ্য। এই শিল্পে কর্মীর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ। এর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা ৭৯ শতাংশ। অথচ পাঁচ বছর আগে এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৫ শতাংশ।

একথা ঠিক প্রেসের মালিকানা এখনও ব্যাপকভাবে অবাঙালীরা কব্জা করতে পারেনি। কিন্তু কাজের ৬০ শতাংশ অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ায় গোটা শিল্পটাই রক্তাল্পতায় ভুগছে। নতুন রক্ত না দিতে পারলে অচিরে এই শিল্পের ভরাডুবি সুনিশ্চিত।

এখন বাঙালীদের হাতে বড় কাজ বাংলা বই ছাপানো। রাহুর গ্রাস সেখানেও। বাংলা বই ছাপানোর কাজ আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে স্কুলে পড়ানো হয় এমন অনেক বাংলা বই এখন ছাপা হয়ে আসছে দিল্লি থেকে। বোম্বাই দিল্লি যেভাবে নতুন সরঞ্জামে সমৃদ্ধ পশ্চিম বাংলা আজও সে জায়গায় পৌঁছতে পারেনি।

রবার

রবার শিল্পও ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতার পর এই শিল্পে সেই একই নিয়মে বাঙালী পিছু হঠতে থাকে। শূন্যস্থান পূর্ণ করতে এগিয়ে আসে পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারি। নতুন নতুন ইউনিট গঠনেও তৎপর অবাঙালীরাই। রবার শিল্পে সাম্প্রতিক সংযোজন যে হাওয়াই চপ্পল, তাতেও বাঙালী নগণ্য, প্রায় সবটাই অবাঙালীদের হাতে। এখন এই বাংলায় রবার শিল্পের ৮৫ ভাগের দখলদার অবাঙালীরা।

রবার শিল্পে বাঙালীর আবির্ভাব কিন্তু বেশি দিনের নয়। ১৯৩০ সালে। তার আগে এই শিল্প ছিল বিদেশীদের কব্জায়। বেশির ভাগটাই আমদানি হত। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে দেশীয় পুঁজিতে এই শিল্প গড়ে

উঠল এই বাংলায়। বাঙালীর উদ্যোগে। এবং সারা ভারতে এ ব্যাপারেও বাঙালীরা ছিল পথিকৃতের ভূমিকায়। কিন্তু ওই সময়ে গড়ে ওঠা এক ডজন বাঙালী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এখন মাত্র একটিই ভালভাবে বেঁচেবর্তে আছে। বাকি সবই হয় একেবারে উঠে গেছে, না হয় হাত বদল হয়ে চলে গেছে মাড়োয়ারি, পাঞ্জাবীদের হাতে। এখন কলকাতা ও তার আশে-পাশে রবার শিল্পের ফ্যাকটরি আছে ১১২টি। ছোট বড় মিলিয়ে। এর মধ্যে বাঙালীর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মাত্র গোটা কুড়ি। রবার শিল্পের একটি বিশেষ শাখা—মোটর গাড়ির পার্টস তৈরীতে এখন আর একজনও বাঙালী নেই। স্বাধীনতার আগে হাওড়া হুগলি ও ২৪ পরগণার নানা জায়গায় এই সব পার্টস তৈরী হত। এখন হয় না। সবটাই আসে হরিয়ানা, পাঞ্জাব থেকে। কিছু আসে বোম্বাই থেকে। এবং এই ব্যবসায় অবাঙালীরাই একচেটিয়া।

মোটর গাড়ীর টায়ার তৈরির মত বড় মাপের শিল্প বাঙালীরা আগেও করে নি, এখনও করছে না। এই ব্যাপারে বিশেষ একটি সংস্থাবই একচেটিয়া কারবার। মধ্যে বাঙালীর উদ্যোগে কলকাতার কাছেই দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। হায়, সেদুটিও শেষ পর্যন্ত অকেজো হয়ে পড়ল। কথা উঠল সরকারী অধিগ্রহণের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিল্লির স্বদেশপ্রেমী কর্তাব্যক্তিরা ঠিক করেছেন, মাড়োয়ারিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিগ্রহণের প্রস্তাবটির এই হল পরিণতি। অন্যান্য শিল্পের মত এই শিল্পেও শ্রমিক হাঙ্গামার অভিযোগটা একেবারে মিথ্যা নয় এবং তা বাঙালীর পক্ষে সর্বক্ষেত্রে শ্লাঘার বিষয় নয়। কিন্তু সাইকেলের টায়ার তৈরীর মত ছোট মাপের শিল্প বাঙালীর হাতে ছিল। স্বাধীনতার আগে বাঙালীরাই সাইকেলের টায়ারের ৬০ শতাংশ সরবরাহ করত। বাকিটা আসত পাঞ্জাব থেকে। এখন কিন্তু অবস্থা একেবারে বদলে গিয়েছে। এখন সাইকেলের টায়ার তৈরি করে—এমন বাঙালী প্রতিষ্ঠান মাত্র একটিই আছে। মোট চাহিদার পাঁচ শতাংশ এখন এখানে তৈরি হয়। বাকিটা আমদানি করতে হয় পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও বোম্বাই থেকে।

বাঙালীর এই পিছিয়ে পড়ার কারণ কি? শিল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের অভিমত হল, রবারের বল তৈরী করাটাই শিল্প নয়। এই শিল্পের প্রাণ রয়েছে তিনটি ক্ষেত্রে—(১) চটকল, (২) রেল, (৩) মোটর গাড়ি। এক মোটর গাড়িতেই প্রায় ২৫০ রকমের রবারের তৈরি পার্টস লাগে কিন্তু তিনটি শিল্পের মধ্যে চটকল ও মোটর শিল্প একচেটিয়াভাবে অবাঙালীদের হাতে। রেলেও উচ্চ-পদাধিকারী অফিসাররা প্রায় সকলেই অবাঙালী। স্বাভাবিকভাবে, বাঙালী দের কাজ পেতে অসুবিধা হয় এই তিন জায়গা থেকে। যদি বা কোন রকমে পাওয়া যায়, তাহলে বিলের টাকা পেতে লাগে দীর্ঘ সময়। এই ধাক্কাটা বাঙালীরা একেবারেই সইতে পারে না। শিল্পেও বাঙালীর দিন আনি দিন খাই অবস্থা। ফলে একবার ব্যবসা করেই এসব জায়গা থেকে বাঙালীকে পাততাড়ি গোটাতে হয়।

দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে রবার শিল্পেও উন্নত কারিগরি ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কিন্তু উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি আমদানি করতে গেলে নতুন করে যে টাকা লগ্নী করতে হয়, তা বাঙালীর নেই। কিন্তু অবাঙালীরা তা পারে। ফলে অবাঙালীদের কাছে বাঙালীরা মার খাচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হাওয়াই চপ্পল। হাওয়াই চপ্পলের জন্য বিশেষ ধরণের যন্ত্র দরকার। অবাঙালীরা তা কিনে নিয়ে চটপট বাজার দখল করে নিল। বাঙালীদের পক্ষে সম্ভব হল না।

বাঙালীদের পক্ষে আর একটি অসুবিধা হল কাঁচামাল, পাওয়া নিয়ে। এই শিল্পের কাঁচা রবার আনতে হয়, কেরল থেকে। কলকাতায় আছে ১৪ জন ব্যবসায়ী—যাঁরা কাঁচা রবার আমদানি করে। এরা সকলেই কেরলবাসী। আর আশ্চর্য, এ ব্যাপারে বাঙালীদের চেয়ে মাড়োয়ারি বা পাঞ্জাবীদের সঙ্গেই কেরলীদের সম্পর্ক সুমধুর।

বস্ত্র

বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনে যখন বাঙলা ও বাঙালী উত্তাল, তখন বিদেশী কারিগরি সাহায্য নিয়েই ভারতীয় শিল্পপতিরা আরব সাগরতীরে একের পর এক কাপড়ের কল বানানোয় ব্যস্ত ছিলেন। বিদেশী বস্ত্র বর্জনের ফলে দেশে পরিধেয় বস্ত্রের যে বিপুল ঘাটতি দেখা দেয়, তার অভাব পূরণ হতে থাকে বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিলের কাপড়ের সরবরাহ থেকে। এই ভাবে পশ্চিম ভারতের বস্ত্রকলগুলি ফুলে ফেঁপে ওঠে। স্বাধীনতার পরেও ওই তারই ধারা অব্যাহত থাকে।

এর মধ্যেও কিন্তু বাঙালীরা এই শিল্পের পত্তন করে বাঙলার মাটিতে। এখানেও সংখ্যায় কম হলেও একের পর এক গড়ে ওঠে মোহিনী মিল, বঙ্গলক্ষ্মী মিল, শ্রীদুর্গা মিল, ঢাকেশ্বরী মিল, চিত্তরঞ্জন মিল ইত্যাদি। কাপড়ের কলের কাঁচা মাল যে তুলো, তা উৎপন্ন হয় মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে। স্বভাবতই মহারাষ্ট্র ও গুজরাট থেকে তুলো আনতে খরচ পড়ে বেশি। বোম্বাই বা আমেদাবাদের তুলনায় অনেক বেশি। সুতরাং বোম্বাই বা আমেদাবাদের উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে বাঙলার উৎপাদন ব্যয় বেশি। কাজেই বাঙলার তৈরি কাপড় প্রতি-যোগিতায় বোম্বাই বা আমেদাবাদের সঙ্গে প্রথম থেকেই পিছিয়ে ছিল। তবু যে বাঙলায় কয়েকটি কাপড়ের কল চলছিল, তার কারণ বয়নশিল্পে বাঙালীর দক্ষতা। মিহি ও বাহারী শাড়ি, ধুতি তৈরিতে বোম্বাই বা আমেদাবাদের চেয়ে বাঙলা ছিল আগুয়ান।

বিপদ ঘটল স্বাধীনতার পর। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, বাংলার কাপড়ের কলগুলির বেশিরভাগ মালিকই ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। তাঁদের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ ছিল পূর্ববঙ্গে। স্বাধীনতার সূত্রে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় এই অর্থ-

নৈতিক বনিয়াদ ধসে যায়। পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেও এঁরা অনেকে কাপড়ের কলগুলি চালু রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু নতুন করে অর্থ লগ্নী করতে না পারায় এবং বোম্বাই ও আমেদাবাদে উৎপন্ন বস্ত্রের সঙ্গে দামের প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে একে একে মিলগুলি হয় বন্ধ হয়ে যেতে থাকে, নয়ত মরণোন্মুখ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে স্বাধীন ভারতে কয়লা লোহা ও ইস্পাতের দামের সমতার সুযোগ নিয়ে ক্রমেই স্ফীত হতে থাকে। এই সময় কেন্দ্রীয় সরকারও সুসম শিল্প বিকাশের নামে আরব সাগর তীরে শিল্পপতিদের যে ধরণের সাহায্য দিয়েছে, পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে তা দেওয়া হয়নি। দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিম বাঙলার উপর কেবল জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধিই নয়, অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রেও যে বিপুল ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল, দিল্লি তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। পশ্চিমবঙ্গ তো শিল্পে এগিয়েই আছে, এই অজুহাতে দিনের পর দিন পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পরন্তু, সেই দাক্ষিণ্য অকৃপণভাবে বর্ষিত হয়েছে পশ্চিম ও উত্তর ভারতে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের ক্রমাবনতির হিসাব নিকাশের একটা চেষ্টা হয়। তখন প্রশ্ন ওঠে, মহারাষ্ট্র গুজরাট কেরল তামিলনাড়ু উত্তরপ্রদেশ যদি পশ্চিমবাংলার কয়লা সরবরাহে ভরতুকি পায়, তাহলে গুজরাটের ও মহারাষ্ট্রের কাছ থেকে তুলা আনার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গই বা ভরতুকি পাবে না কেন? কথাটা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলেও উঠেছিল। কিন্তু তিনি কেন্দ্রের কাছে তা তোলেননি। প্রথম তোলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। ১৯৭২ সালে তিনি কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেন, তুলার দামেও সমতা আনা হোক। তখন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনিও বাঙালী। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবুর এই দাবি তিনি পূরণ করতে পারেননি। এখন বামফ্রন্ট সরকার থেকে তুলোর দামের সঙ্গে বোম্বাই থেকে কেমিক্যালস, টুটিকোরিন থেকে নুনের দামেও সমতা বিধানের দাবি তোলা হয়েছে। কেন্দ্র কর্ণপাত করেনি। বরং একে বিচ্ছিন্নতাবাদের জিগির বলে উল্টো চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

বস্ত্রশিল্পে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হল কৃত্রিমতন্তুজ বস্ত্রের উদ্ভাবন। বিদেশে উদ্ভাবিত এই কলাকৌশল ভারতেও সংক্রামিত হয়। এর জন্য নতুন ধরণের যন্ত্রপাতি ও নতুন প্রশিক্ষণের দরকার হয়। আর তার জন্য চাই নতুন করে অর্থ বিনিয়োগ। অবাঙালী ব্যবসায়ীদের পুঁজি বেশি। তাঁরা সহজেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পেরেছেন। এর জন্য যে কেমিকেল দরকার হয়, তা মেলে বোম্বাইতে। ফলে এই ধরনের বস্ত্রশিল্পেরও পত্তন হল আরব দরিয়ার তীরে। টাকার অভাবে, কাঁচামালের অভাবে পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্প গড়ে উঠতে পারল না। বরং সাবেক যে কাপড়ের কলগুলি ছিল, তা বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রের কাছে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে কোনটা উঠে গেল, কোনটা উঠে যাওয়ার মুখে।

হোটেল

শিল্পে বাঙালীর ক্রমিক পশ্চাদপসারণের ব্যাপারটা কীর্তিনাশার কৌশলের মত। ক্ষতি যে হয়ে যাচ্ছে, তাও টের পাওয়া যাচ্ছে না। যখন সম্বিৎ ফিরে আসে, তখন আর কিছু করার থাকে না। গোটা ব্যাপারটাই হাতের বাইরে চলে যায়। বড় বড় শিল্পে, সংগঠিত শিল্পে বাঙালীর ভাগ্যের লিখনকে কিছু তুলে ধরা হল। কিন্তু ব্যাপারটা সামান্য ও প্রায় অনুল্লেখ্য শিল্পক্ষেত্রেও ঘটছে একই কায়দায়। যেমন, হোটেল শিল্পে। এখানেও একই চিত্র। বাংলার হোটেলে, বাঙালীর খাবার হোটেলে, বাঙালীর অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এমন কি, একদা খ্যাত পাইস হোটেল, যা এখন রূপী হোটেল, যা একান্তভাবে বাঙালীর ঘরোয়া ব্যাপার, সেখানেও বিহার আর ওড়িশার আগ্রাসন অব্যাহত। হোটেল শিল্পের একটি সুন্দর রেখাচিত্র পাওয়া যায় সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের রচনায়।

হোটেল শিল্পে বাঙালীর দুরবস্থার কথা বাঙালীরাই সঠিকভাবে জানে না। জানলেও ঠিক বুঝতে পারে না। অবশ্য আজ এখানে সারা পশ্চিমবঙ্গের নয়, শুধু কলকাতা এলাকারই হোটেল শিল্পের চিত্র দেওয়া হচ্ছে। তবে কলকাতায় যে চিত্র সেই চিত্রই সারা পশ্চিমবঙ্গের। চিত্রটি হচ্ছে এই শিল্পেও বাঙালীর প্রায়পূর্ণ অনুপস্থিতি। এখানে প্রতিদিনই নতুন, নতুন লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এখানে বাঙালীর অস্তিত্ব ক্রমক্ষীয়মাণ হয়ে আসছে।

হোটেল শিল্প, মানে বড় মাঝারি হোটেল আর তার সঙ্গে রেস্তোরাঁ ইত্যাদিরও আলোচনা করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি হোটেল, রেস্তোরাঁকে কলকাতা পুলিশ থেকে লাইসেন্স নিতে হয়। তাই লাইসেন্স দেবার নিয়মকানুন মোটামুটি-ভাবে বললে বুঝতে সুবিধে হবে। যেসব থাকবার জায়গায় বিলিতি (ভারতে প্রস্তুত বিলিতি মদ, অর্থাৎ হুইস্কি, বিয়ার, জিন ইত্যাদি) মদ সরবরাহ করা হয় সেগুলিকে পুলিশী লাইসেন্সে হোটেল বলা হয়। এই শ্রেণীতে পাঁচ তারা থেকে দু' তারা হোটেলগুলো পড়ে। যে হোটেলে মদ সরবরাহ করা হয় না, সেগুলোকে বলা হয় ইটিং হাউস। ইটিং হাউসে থাকার জায়গা থাকতে পারে। আবার নাও থাকতে পারে। তবে এগুলোতে ভাত সরবরাহ করা হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েছে রেস্তোরাঁ। এগুলোতে সাধারণত ভাত বিক্রি হয় না। তবে বিলিতি মদ বিক্রি করা রেস্তোরাঁয় ভাত বিক্রি হতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে পড়া হোটেলের সংখ্যা খুব বেশি না। গোটা দশেক বড় আর মাঝারি হোটেল কলকাতায় আছে। এগুলো সুসংগঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইটিং হাউস। এর সংখ্যা হাজার দুয়েকের মতো। তৃতীয় হচ্ছে রেস্তোরাঁ। তারও সংখ্যা দু'হাজারের কিছু বেশি। প্রথমে আসা যাক হোটেলগুলোর ব্যাপারে। এখানে সবচেয়ে বড় হোটেলে কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে আটশ'র মতো। ছোট হোটেলের কর্মচারীর সংখ্যা অন্তত পঞ্চাশ জন হবে। সবচেয়ে বড় হোটেলের বেয়ারাদের মাইনে কম করেও পাঁচ ছ'শো টাকা। তার সঙ্গে বোনাস

আছে, টিপস আছে। কিছু কিছু উপহারও মেলে। একটু তলিয়ে দেখলে জানা যাবে, এই শ্রেণীর বেয়ারারা মাইনে টিপস মিলিয়ে মাসে প্রায় হাজার টাকার কম কেউ-ই রোজগার করেন না। অনেকে আরো বেশি রোজগার করেন। এখানে বাঙালী বেয়ারার সংখ্যা গুণতে গেলে লজ্জা পেতে হবে। বোধকরি শতকরা কুড়িজনও না। বিহারি, মাদ্রাজী, ওড়িয়া কিংবা দক্ষিণ ভারতীয় দিয়ে ঠাসা। বাঙালীরা বেয়ারার কাজ করেন না, এমন নয়। প্রচুর বাঙালী ছেলে বেয়ারার কাজ চান। কিন্তু এখানকার সঙ্ঘবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন বর্তমান কর্মীদেরই স্বার্থ দেখে। তাই পুরানো কর্মীদের ছেলেরা বা আত্মীয়রা নতুন চাকরিতে ঢোকে। এখানে বলা দরকার এই হোটেলগুলোর, মালিকানা পুরোপুরি অবাঙালীদেরই হাতে। শুধু একটি হোটেল রাজ্য সরকারের। সেখানে অবশ্য বাঙালীর ঢুকতে বাধা নেই। শুধু তলাকার চাকরিতেই নয়। বড় মাঝারি হোটেলের মাঝামাঝি শ্রেণীর চাকরিতেও বেশ ভাল মাইনে। একজন স্টুয়ার্ড, বেল ক্যাপ্টেন হাজার টাকার বেশি রোজগার করে থাকেন। এই চাকরিগুলোর যোগ্যতার মূল মাপকাঠি হচ্ছে ভালো ইংরেজী বলা আর স্মার্টনেস। ডানহাতে ঘড়ি বাঁধা মিশনারী স্কুলে পড়া বাঙালী ছেলের অভাব নেই দেশে। কিন্তু তারা চাকরি পায় না। পায় অবাঙালীরা। তার কারণ, হোটেলগুলোর অধিকাংশই অবাঙালী। ওঁরা স্বজাতীয়দেরই বেশী পছন্দ করে থাকেন। লেখাপড়া জানা বাঙালীর ছেলেরা এখানে প্রায় অনাদৃত।

এবার ইটিং হাউসগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করা যাক। এখানে অবশ্য নানান ধরণের মাইনে আছে। কোথাও মাসে দুশো টাকা। কোথাও পাঁচ ছ'শো। টিপস প্রায় সব জায়গাতেই কম বেশী হতে পারে। কিন্তু এখানেও দেখা যাবে, বাঙালী ছেলেদের কোন কদর নেই। অধিকাংশই ইটিং হাউসের মালিক অবাঙালী। তাঁরা স্বজাতি কিংবা অন্য অবাঙলীদেরই বৈশি পছন্দ করেন। দুর্ভাগা পশ্চিমবঙ্গে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যাতে এগুলোতে বাঙালীদের চাকরি দেবার জন্যে চাপ সৃষ্টি করা যায়।

রেস্তোর্‌াঁর ব্যাপারেও প্রায় একই চেহারা। এদের সংখ্যা দু'হাজারের কিছু বেশি। ছোট ছোট কিছু রেস্তোর্‌াঁ ছাড়া প্রায় সব বড় রেস্তোর্‌াঁর মালিক অবাঙালী। কর্মচারীদের মাইনের কোন নির্দিষ্ট মান নেই। ছোট রেস্তোর্‌াঁর কর্মী হচ্ছে বাচ্চা ছেলেরা। এরা অবশ্য অধিকাংশই বাঙালী। গরীব পরিবার গুলো থেকে এসেছে। দশ পাঁচ টাকা মাইনে। শুধু পেটে - ভাতের চাকরি। এখানে কয়েকটি রেস্তোর্‌াঁ ছাড়া অধিকাংশ মালিকেরই তেমন কিছু রোজগার নয়। চাকরির ব্যাপারে এগুলো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু কলকাতায় আর এক শ্রেণীর ফ্যাসানেবল্ রেস্তোর্‌াঁ আছে। পার্কস্ট্রীট ধরে এগুলো ছড়িয়ে আছে। বিরাট রোজগার। বলতে দুঃখ হয়, পার্কস্ট্রীটে আজকে একটি ফ্যাসানেবল রেস্তোর্‌াঁর মালিকও বাঙালী নন। এখানকার মালিকরা হচ্ছেন হয় সিন্ধি, নয় পাঞ্জাবি। রেস্তোর্‌াঁগুলোর বেয়ারার বেশ মাইনে। প্রচুর টিপস পাওয়া যায়। সবটা মিলিয়ে অর্ধশিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত ছেলেদের পক্ষে লোভনীয় চাকরি। কিন্তু এখানেও একই অবস্থা। বাঙালী বেয়ারা প্রায় নেই বললেই চলে। পার্কস্ট্রীটে একটি চীনা খাবারের রেস্তোর্‌াঁ আছে। মালিক গোয়ানিজ। বিশ্বাস করুন। এই রেস্তোর্‌াঁর প্রত্যেকটি কর্মচারী অবাঙালী, প্রায় সবাই গোয়ানিজ। এখানকার কর্মচারী ইউনিয়নের কর্তা কিন্তু একজন বাঙালী। তিনি কিন্তু কোনোদিন বাঙালী কর্মী নেবার কথা উচ্চারণ করেন না। কেননা তা করলে ওঁর ট্রেড ইউনিয়ন মাতব্বরীতে সংশয় দেখা দেবে। শুধু বেয়ারা কেন? এই রেস্তোর্‌াঁর গার্ডদের মাইনেও মোটামুটি হারে ভালো। কিন্তু মাইনের সঙ্গে টিপস এর পরিমাণ যুক্ত হয়ে একটা মোটা টাকা এঁরা মাসান্তে পেয়ে থাকেন। কিন্তু এখানেও বাঙালী ছেলে অনাদৃত। পার্কস্ট্রীটের রেস্তোর্‌াঁয় বসলে আপনাদের মনে হবে যেন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোনো রেস্তোর্‌াঁয় আপনি বসে আছেন। এখানে চালু ভাষা হচ্ছে ইংরিজি। কিছু হিন্দিও চলে। তা চলুক ক্ষতি নেই। কিন্তু বাঙালী ছেলেরাও তো ভালো ইংরেজি আর চলতি হিন্দি বলতে পারে। তবু কেন তাদের নেওয়া হবে না?

কলকাতার হোটেলে শিল্পে বাঙালীর এই দুরবস্থার কাহিনীর সঙ্গে আর একটি দুঃখজনক ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। এটি হচ্ছে, হোটেল শিল্পে বাঙালীর এই উপেক্ষিত হবার পেছনে কলকাতা পুলিশের অবদান। প্রত্যেকটি হোটেল, ইটিং হাউস আর রেস্তোরাঁর জন্যে পুলিশ লাইসেন্স লাগে। বলা বাহুল্য, এই লাইসেন্স পেতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ঘুষ দিতে হয়। বিনা ঘুষে হোটেল রেস্তোরাঁর লাইসেন্স পাওয়া একটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। প্রধানত থানাই হচ্ছে এই ঘুষ নেবার মূল গায়েন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছি, দক্ষিণ আর উত্তর কলকাতায় কোনো বাঙালী যদি হোটেল রেস্তোরাঁর লাইসেন্সের জন্যে আবেদন করেন, তাহলে যেন একটা অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী থানাগুলো তা নামঞ্জুর করার শুপারিশ করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওদের এক যুক্তি, যানবাহন চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। যাঁরা এই নামঞ্জুরির সুপারিশের পরও হেডকোয়ার্টাসের ডেপুটি কমিশনারকে ধরতে পারেন তাঁরা লাইসেন্স পেতেও পারেন। অন্যেরা পাবেন না। কিন্তু নামঞ্জুর সুপারিশের আসল কারণ হচ্ছে বাঙালীরা মোটা টাকার ঘুষ দিতে পারেন না। কেননা বাঙালীদের আর্থিক সঙ্গতি অনেক কম। অবাঙালীরা প্রচুর ঘুষ ঢেলে দেয়। লাইসেন্সও পেয়ে যায়। পুলিশের এই হচ্ছে শোচনীয় মনোবৃত্তি। শুধু আজকের নয়, অনেক দিনের পুরনো এই ব্যাপারটা। পুলিশ অবাঙালীদের লাইসেন্স দেবার সময় বাঙালী কর্মী নিয়োগের জন্যে যদি চাপ সৃষ্টি কোরতো, তাহলে হয় তো কিছু বাঙালী চাকরি পেতো। ন্যায় বিচারের মাপকাঠিতে ব্যাপারটা একটু বেমানান দেখাতেও পারে। কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে তো দিব্যি চাপ দিয়েই চাকরি আদায় করা হয়। তাহলে এখানেই যদি এই কৌশলটা একটু-আধটু নেওয়া হয়, তাহলে মহাভারত কী এমন অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

তাঁত

বাংলার তাঁত শিল্পের সুনাম বেড়েছে বই কমেনি। এই রাজ্যের তাঁত শিল্পী-রাও সবাই বাঙালী। কিন্তু এই শিল্প বাঙালীর হাতে নেই। শিল্পের আসল মালক বড়বাজারের অবাঙালী মহাজনরা। বাঙালীরা বেশির ভাগই আসলে এই শিল্পের কারিগর মাত্র। ইদানীং রাজ্য সরকারের কিছু সাধু প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁত শিল্পের এই অবস্থায় বড় একটা হেরফের হয় নি। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলার তাঁত শিল্প দ্রুত অবাঙালীদের হাতে চলে যায়। এখন শিল্পে বাঙালী যথার্থই 'নিজ বাসভূমে পরবাসী।'

স্বাধীনতার আগে মোহিনী, বঙ্গলক্ষ্মী, ঢাকেশ্বরী, শ্রীদুর্গা মিলে মোটা সুতোর সঙ্গে সূক্ষ্ম মাপের সুতোও যথেষ্ট তৈরি হত। তখন সুতোর জন্য বাংলার তাঁতীকে অন্য রাজ্যে বড় একটা হাত পাততে হত না। স্বাধীনতার পর ওই মিলগুলি পঙ্গু হয়ে পড়ল। পূর্ববাংলা থেকে অনেক তাঁতী এলেন পশ্চিমবঙ্গে। চাহিদাও বাড়ল। এই অবস্থায় সুতোর জন্য ভিন রাজ্যের দ্বারস্থ হতে হল। এখন বছরে পশ্চিমবাংলায় ১৫ হাজার গাঁট সুতোর দরকার হয়। এর মধ্যে ৮৫ শতাংশই আসে অন্য রাজ্য থেকে। বেশির ভাগটাই আসে দক্ষিণ ভারত থেকে। এই সুতো আমদানির ব্যাপারটা পুরোপুরি বড়বাজারের অবাঙালী মহাজনদের কব্জায়। রাজ্য সরকার সামান্য কিছু সুতো কেনেন সরাসরি মিল থেকে নির্দিষ্ট দরে। বাকি সবটাই বিক্রি করে থাকে এই মহাজনরা। বাংলার বেশিরভাগ তাঁতীকেই নির্ভর করতে হয় এইসব মহাজনদের উপর। এবং এইসব মহাজনদের সুতো নিয়ে ফাটকাবাজির বিরুদ্ধে কথা বলার এক্তিয়ার কারো নেই। রাজ্য সরকারও অপারগ।

সুতো কিনতে গিয়ে তাঁতীকে এই মহাজনদের খেয়ালখুশির শিকার হতেই হবে। এরা ইচ্ছেমত দাম বাড়ায়। কতটা সুতো বিক্রি করা হবে—তাও

নির্ভর করে এদেরই একতরফা সিদ্ধান্তের উপর। সুতো কিনলে মহাজনরা যে রসিদ দেয়, তাতে যে দাম লেখা থাকে, আসল দাম তার চেয়ে বেশি। এই বেশি টাকাটা দিতে হয় কালো টাকায়। স্বাভাবিক ভাবেই, বে.শ দামে সুতো কিনলে শাড়ি ধুতির দাম যা পড়ে, বাজারের দাম অনেক সময়ই তার চেয়ে কম। কারণ, বাজার দরটাও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ওই মহাজনরাই। ফলে, তাঁতীরা বেশির ভাগই সামান্য লাভে উৎপন্ন পণ্য বড়বাজারের মহাজনদের কাছেই বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। ওই মহাজনরাই পরে তিন গুণ দামে সেইসব শাড়ি ধুতি বাজারে বিক্রি করে থাকে। এই ভাবে সুতো সরবরাহ থেকে পণ্য বিক্রির বাজার পর্যন্ত সবটাই অবাঙালীদের হাতের মুঠোয়। লাভের গুড় খাচ্ছেও ওরাই। বাঙালীরা কারিগর বনে গিয়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অভাবে অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। এখন এই রাজ্যে সাড়ে পাঁচ লক্ষ তাঁতী আছেন। তাঁত আছে সোয়া দু লক্ষের মত। কিন্তু ৭০ শতাংশ তাঁতের সম্বৎসর কাজ থাকে না।

তাঁতীদের বাঁচাতে আছেন রাজ্য সরকার। এত দিন সরকারী উদ্যোগ তেমন লক্ষ্য করা যায় নি। হালফিল সরকারী প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই। ব্যাঙ্ক থেকে যে ঋণ দেওয়া হয়, তাতেও তেমন সুফল ফলে নি। কেননা, উৎপন্ন পণ্য বিক্রির জন্য ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পাওয়া তাঁতীদের বড়বাজারের সেই মহাজনদের কাছেই যেতে হয়। বড়বাজারের মহাজন ছাড়াও তাঁতীদের আরও এক শ্রেণীর মহাজনের কাছে হাত পাততে হয়। এরা হল স্থানীয় মহাজন। খুব কম তাঁতীই আছেন, যাঁরা নিজেদের টাকায় অতিরিক্ত দামে সুতো কিনতে পারেন। সরকারী সাহায্য ও ব্যাঙ্কের ঋণ পেয়ে থাকেন অল্প লোকই। বেশির ভাগ তাঁতীকে সুতো কেনার জন্য চড়া সুদে টাকা ধার করতে হয় স্থানীয় মহাজনদের কাছে। আর, এই মহাজনরাও সবাই অবাঙালী। এইভাবে বাংলার তাঁত ও তাঁতীরা অবাঙালী মহাজনদের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে।

স্বাধীনতার পর অন্য রাজ্যের তাঁত শিল্প রাজ্য সরকারগুলির প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও সহযোগিতায় বিপুল বিকাশ লাভ করেছে। এই রাজ্যে অনুরূপ ঘটনা গত তিরিশ বছরে বড় একটা ঘটে নি। তাই বাংলার তাঁত শিল্পকে এখন কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় বাংলার তাঁতশিল্প ক্রমাগত পিছু হটছে। এ ব্যাপারেও বড়বাজারের অবাঙালী মহাজনদের একটা বড় ভূমিকা আছে। অন্য রাজ্যে বাংলার তাঁতশিল্প তেমন প্রসার লাভ করেনি। অন্য দিকে বাস্তব ঘটনা হল, এই রাজ্যের বাজার দখল করছে হরিয়ানা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, ওড়িশার তাঁতশিল্প। এই বাজার দখলে অন্য রাজ্যের রাজ্য সরকার যেমন উৎসাহী, তেমনি উৎসাহী বড়বাজারের মহাজনরা। বাজার দখলের লড়াইয়ে এরা ইন্ধন যোগাচ্ছে সুতোয় টান মেরে। ইচ্ছে-মত দাম বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এই মহাজনরা সুতোর কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতেও কার্পণ্য করে না। ধরাছোঁয়ার বাইরে এই মহাজনী অসাধুতার ফলে মার খাচ্ছে বাংলার তাঁত, বাংলার তাঁতী।

ইঞ্জিনীয়ারিং

একমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং কাজেই বাঙালীর দক্ষতা এখনও প্রশ্নাতীত। কিন্তু এই শিল্পে বাঙালীর পূর্ব গৌরব আর নেই। বাঙালী হালফিল ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে অচ্ছুৎ। একদা বাঙলার শেফিল্ড নামে খ্যাত হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডের ভাগ্য বিপর্যয় থেকেই গোটা পশ্চিমবঙ্গে বাঙালীর দুর্ভাগ্যের একটি করুণ ছবি পাওয়া যাবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাঙালীরাই এই রাজ্যে বেলিলিয়াস রোডে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প গড়ে তোলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই শিল্পের তুঙ্গে বৃহস্পতি। তখন এখানকার প্রায় ৩০০ ইউনিটের সব কয়টিরই মালিক

বাঙালী। কর্মীরাও শতকরা একশ ভাগ বাঙালী। কিন্তু স্বাধীনতার পর খুব দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটতে লাগল। বাঙালী-অধ্যুষিত বেলিলিয়াস রোড এখন মৃত্যুশয্যায়। অল্প দূরে বেনারস রোডে অবাঙালী-প্রধান নতুন ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প এলাকা গড়ে উঠল। তা স্বাস্থোজ্জ্বল এবং ক্রমবর্ধমান।

স্বাধীনতার পর অবাঙালীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে লোকসানের কড়ি গুণতে গুণতে বেলিলিয়াস রোডের বাঙালী ইউনিটগুলি একের পর এক বন্ধ হতে লাগল। কিছু অন্যত্র স্থানান্তরিত হল। কিছু হাতবদল হল—বাঙালী থেকে অবাঙালীর হাতে। এখনও বেলিলিয়াস রোডে একশ'র কিছু বেশি ইউনিট আছে। সেগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় দাশনগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল নতুন এলাকা। সেখানে ঠাঁই হল একচেটিয়াভাবে অবাঙালীদের। ওই বেনারস রোডের দু' পাশে এখন আছে হাজার দুই ইউনিট। এর শতকরা ৮০ ভাগের মালিক অবাঙালী। তবে কর্মী হিসাবে আজও এই রাজ্যে এই শিল্পে বাঙালীর সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ।

কেন বাঙালীর এই বিপর্যয়? এ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে যেসব তথ্য জানা গিয়েছে, তা থেকে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, বাঙালীকে এই শিল্প থেকে উৎখাত করার একটা প্রচেষ্টা আছে দিল্লি থেকে কলকাতা—সর্বত্র। এই শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচা মাল পেতে বাঙালীদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। সময়মত পাওয়াও যায় না। কাঁচা মাল বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণের গোটা ব্যাপারটাই অবাঙালী 'অপসর লোগের' দখলে। সেক্ষেত্রে অবাঙালীরা অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা পেয়ে আসছে। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা বেশির ভাগই অবাঙালী। দেখা যায়, মাল ডেলিভারি দেওয়ার পর টাকা পেতে বাঙালীদের কখনও বছর ঘুরে যায়। অথচ অবাঙালীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রাপ্য টাকা পেয়ে যায়। এই সব বাধা অতিক্রম করা যায়, যদি ঘুষ দিয়ে যাওয়া যায় নিয়মিত ও সময়মত। কিন্তু সেখানেই বাঙালীর সবচেয়ে

বড় অসুবিধা। ঘুষের যোগান অব্যাহত রাখার মত টাকা বাঙালীর হাতে নেই।

দেখে শুনে মনে হয়েছে, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে আসল কারবার ঘুষের কারবার। এই শিল্পে ঘুষের টাকা উড়ে বেড়ায়। অবাঙালীরা ঘুষের কারবারে মুক্তহস্ত। বাঙালীরা ঘুষ দিতে গিয়ে প্রাণান্ত। সন্দেহ নেই, ঘুষের টাকা মানেই কালো টাকা। বাঙালীর হাতে অত কালো টাকা নেই। কম রেট দেওয়া সত্বেও বাঙালীরা টেনডার পায় না। ইন্সপেকটারের রিপোর্ট: অমুক প্রতিষ্ঠান নির্ভরযোগ্য নয়। ব্যস্ বাঙালী প্রতিষ্ঠানের টেনডার বাতিল হয়ে গেল। অন্যদিকে বেশি রেট দেওয়া সত্বেও ইন্সপেকটারের বিবেচনায় সেই প্রতিষ্ঠান নির্ভরযোগ্য হওয়ায় এবং আগের রিপোর্টে বাঙালী প্রতিষ্ঠানটি অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় অবাঙালী প্রতিষ্ঠানটি টেনডার পেয়ে গেল। ঘুষের টাকায় এসব হয়। মাল দিয়ে প্রাপ্য টাকা পেতে গেলেও ঘুষের টাকাই আসল টনিক। টেনডার থেকে পেমেণ্ট—সর্বত্র ঘুষের দাপটে এই অবস্থা চলছে। ঘুষ দেয় অবাঙালীরা। ঘুষ খায় অবাঙালী বাঙালী উভয়েই। তফাৎ শুধু এই, অবাঙালী ভাইরা ঘুষ খেলেও স্বজাতির স্বার্থটা অন্ততঃ দেখে। বাঙালীবাবুরা ঘুষটা খায়, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন স্বজাতি প্রীতি নেই। একটা উদাহরণ দিই। দাশনগরে জেলা শিল্প অধিকর্তার অফিসে কোন বাঙালী লাইসেন্সের জন্য আবেদন করলে তা ১ বছর কি ২ বছরের আগে মঞ্জুর হয় না। অথচ, কোন অবাঙালী আবেদন করলে তার রেজিষ্ট্রেশন পেতে সময় লাগে সাতদিন। এ সম্পর্কে তথ্য আমার কাছে আছে। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তদন্ত করে দেখতে পারেন।

এর পরেও যে সব বাঙালী এই শিল্পে বেঁচেবর্তে আছে, হালফিল বিদ্যুৎ সংকট ও শ্রমিক হাঙ্গামা তাদের নাভিশ্বাস ওঠার কারণ হয়েছে। মোটামুটিভাবে হাওড়ার ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের যে ছবি পাওয়া গেল, রাজ্যের অন্যত্র আসানসোল, দুর্গাপুর, ব্যারাকপুর, বজবজ, খড়গপুর সর্বত্রই এই একই ছবি। সর্বত্রই

বাঙালী পিছু হটছে, অবাঙালীরা সেই জায়গা দখল করছে। অনেকেরই আশঙ্কা, আর এক দশক পরে এই শিল্পে হাজার অক্সিজেন দিয়েও বাঙালীকে বাঁচানো যাবে না।

পরিবহণ

পরিবহণে এই বাংলায় বাঙালীর স্থান একেবারে পিছনের সারিতে। পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থায় বাঙালীর নাম অনুসন্ধানে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। জন পরিবহণ ব্যবস্থায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাঙালী আর মালিক বা চালকের আসনে নেই, তার স্থান যাত্রীর আসনে। সহায়ক শিল্প—মোটর গাড়ির যন্ত্রাংশ ও বিক্রির ব্যবসায় বাঙালী নিশ্চিহ্ন প্রায়।

পরিবহণ শিল্পে সরকারী ব্যবস্থা—বাস, ট্রাম, ট্রেন, বিমান—এই হিসাবের বাইরে রেখেছি। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাস, লরি, ট্যাকসি, মোটর গাড়ি টেম্পো—রাজ্যব্যাপী পরিবহণ শিল্পের বড় হিস্যা। আর এখানেই বাঙালী ক্রমে পিছু হঠছে। এই রাজ্যে প্রাইভেট মোটর গাড়ির আছে ১ লক্ষ ১০ হাজার। এর মধ্যে মাত্র ৩০ হাজার মোটর গাড়ির মালিক বাঙালী। বাঙালীদের নাকি আর মোটর গাড়ি কেনা ও তা চালানোর মত হিম্মৎ নেই। খরচ যা বেড়েছে তাতে কালো টাকা না থাকলে নাকি মোটর গাড়ির মালিক হওয়া সম্ভব নয়। শিল্পপতিই হোন আর বড় চাকুরেই হোন, বাঙালীর হাতে যথেষ্ট কালো টাকা নেই। ফলে দেখা যাচ্ছে বাঙালীরা মোটর গাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছে। অবাঙালীরা তা কিনছে। নতুন মোটরগাড়ি কেনার জন্য ক্রেতার তালিকায় বাঙালীর নাম খুঁজে পাওয়া দুস্কর। এই রাজ্যে মোটর গাড়ি ও

লরি বানানোর একটি মাত্র কারখানা আছে। অনিবার্যভাবে এর মালিক অবাঙালী। এই কারখানার ১৫ হাজার শ্রমিকের ৬০ শতাংশই অবাঙালী।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রাদেশিকতার দুর্নাম গায়ে না মেখে ২০০ ট্যাকসি পারমিট দিয়েছিলেন বেছে বেছে বাঙালীদের। ডাঃ রায়ের এই সদিচ্ছার পরিণতি কিন্তু ভাল হয়নি। এখন কলকাতায় ৫ হাজার ট্যাকিসর মধ্যে মাত্র ৩৫ শতাংশ আছে বাঙালীর হাতে, ট্যাকসি ড্রাইভার আছে ৮ হাজার, তার মধ্যে বাঙালী মাত্র ৩ হাজার। অন্যদিকে হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীরা কিন্তু ট্যাকসি চালিয়ে বহাল তবিয়তে রয়েছে। বাঙালীরা পারছে না কেন? এক, পুলিশের অত্যাচার। দুই, বাঙালীরা নিজেরা ট্যাকসি চালায় না। হিন্দুস্থানী বা পাঞ্জাবীরা সকলেই একই সঙ্গে মালিক ও চালক। ফলে, উপার্জন বেশি। মিনিবাস ও টেম্পোর মালিকানা এখনও বাঙালীদের হাতেই বেশির ভাগ রয়েছে। কিন্তু, আগের চেয়ে কমেছে। মিনিবাসের কোন স্পষ্ট ছবি পাইনি। বহু মালিক ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করেননি—এই তথ্যটা পাওয়া গিয়েছে। টেম্পোর ক্ষেত্রে অসুবিধা ভাড়া পাওয়া। ব্যবসা বানিজ্যে শিল্পে অবাঙালীদের প্রাধান্য থাকায় বাঙালীরা তুলনামুলকভাবে ভাড়া কম পেয়ে থাকে। তার উপর ঘাটে ঘাটে ঘুষ দিতে গিয়ে জেরবার।

বেসরকারী বাসের সংখ্যা ১৯৭৫ সালে ছিল ৮ হাজার। এর মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশের মালিক ছিল বাঙালী। এখন রাজ্য জুড়ে বাসের সংখ্যা ১২ হাজার। কিন্তু বাঙালী মালিক ৬০ শতাংশের বেশি নয়। রুটের সংখ্যা বেড়েছে, বাসের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু বাঙালী মালিকের সংখ্যা কমেছে। এর কারণ হিসাবে বাস-মালিকরা একমাত্র শ্রমিক হাঙ্গামাকেই দায়ী করেছেন। ফলে, বাস আস্তে আস্তে লরি বানিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। বাসের শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা সবাই বাঙালী হলেও ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টারদের ৮০ শতাংশই পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী। কেবল কলকাতায় বা শহরতলিতে নয়, মফঃস্বলেও এই একই চিত্র।

পণ্য পরিবহনের বড় মাধ্যম লরি বা ট্রাক। এখন এই রাজ্যে লরি আছে প্রায় ৫০ হাজার। এর মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ লরির মালিক বাঙালী। এই ব্যবসায় পাঞ্জাবীরাই একচেটিয়া। মাড়োয়ারির সংখ্যাও কম নয়। অন্তত, বাঙালীর তুলনায় ঢের বেশি। লরির ড্রাইভার ও শ্রমিক মিলিয়ে আছে প্রায় দু' লক্ষ লোক। এদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা নগণ্য। এখানে বাঙালী খুঁজতে আপনাকে শক্তিশালী অনুবিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবেই। লরির ব্যবসায় বাঙালীর পিছিয়ে পড়ার কারণঃ (১) বড় বড় শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অবাঙালীদের হাতে। ফলে, মাল পরিবহনের অর্ডার অবাঙালীরা যে পরিমাণ পায়, বাঙালীরা তার চেয়ে কম পায়। (২) বাঙালী মালিকদের নির্ভর করতে হয় অবাঙালী ড্রাইভার ও শ্রমিকদের উপর। এদের কাছেও বাঙালী মালিককে নানাভাবে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। (৩) লরি চলে ঘুষের জোরে। বাঙালী মালিকরা ঘুষের প্রতিযোগিতায় প্রায় ক্ষেত্রেই অবাঙালী মালিকদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। পরিবহন ব্যবস্থা সংস্থা আছে এই রাজ্যে প্রায় ২০০টি। এর মধ্যে বাঙালী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মাত্র ৬টি। এই ৬টির মধ্যে ৩টি একটু বড় মাপের। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ব্যবসা করে —এমন বাঙালী পরিবহন প্রতিষ্ঠান এখন একটিও নেই।

বাস, লরি, মোটরগাড়ি—সবকিছুরই যন্ত্রাংশ এ-রাজ্যে তৈরি হয় না। যতটুকু হয়, তা হিসাবের কড়ি দিয়ে মাপা যায় না। সবটাই আসে প্রায় হরিয়ানা ও পাঞ্জাব থেকে। এ ব্যাপারে ওই দুই রাজ্যই একচেটিয়া। কলকাতায় মোটর স্পার্টস বিক্রির ৯ হাজার ৬০০টি দোকান আছে। এর মধ্যে বাঙা- লীর দোকান মোটে ৯৫টি, তাও ছোট সাইজের।

চলচ্চিত্র

স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে বাঙালীর সূর্যাস্ত। দেশ বিভাগের জোয়ারে ভেসে এই শিল্পে পথিকৃত বাঙালী এখন স্বগৃহে উদ্বাস্তু। আমি অবশ্যই এই শিল্পের আর্টের কথা বলছি না। বরং স্বাধীনতার পরেই বাংলা চলচ্চিত্র বিশ্বসভায় সম্মানের আসন পেয়েছে। আমি বলতে চাইছি এই শিল্পের সেই কথা—যা নাকি অনিবার্যভাবে বাঙালী থেকে অবাঙালীর মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে। এই শিল্পে বাঙালীরা এখন শিল্পী, অবাঙালীরা শিল্পপতি।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, গোটা ভারতেই চলচ্চিত্র শিল্পে বাঙালীরাই ছিল পথিকৃত। তখন বাংলা ছবি ছাড়াও পূর্ব ভারত ও দক্ষিণের অন্যান্য ভাষার ছায়াছবি এই কলকাতায় তৈরি হত। তখনকার বাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলা ছাড়াও তামিল তেলুগু ও হিন্দি ভাষায় ছবি তুলতো। সারা ভারত জুড়ে চলচ্চিত্র শিল্পে বাংলার ও বাঙালীর অপ্রতিহত প্রধান্য ছিল। স্বাধীনতার কিছু আগে থেকেই আরবসাগর তীরে হিন্দি ছায়াছবির বর্ণাঢ্য জগৎ গড়ে উঠতে লাগল। স্বাধীনতার পর চেহারাটা একেবারে বদলে গেল।

বাংলা ছবির উপার্জনের ৬০ শতাংশ আসত পূর্ববাংলা থেকে। স্বাধীনতার পর এখানকার বাংলা ছবির সেই সোনার বাজার হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্যদিকে বোম্বাইয়ের ফিল্মী দুনিয়া আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে সারা ভারত জুড়ে বাজার তৈরি করে ফেলল। হিন্দি ছবির বাজার তৈরির বড় সুবিধা হল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পে যে মোটা মাপের টাকার জোগান দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল, অবাঙালী ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের পক্ষে তা দিতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু, বাঙালীদের পক্ষে পুঁজির অভাব দেখা দিল। আগেকার আমলের চিত্রনির্মাতারাও অনেকে এত বেশি টাকার ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। কারো কারো

পক্ষে এত টাকা যোগান দেওয়ার সামর্থ্যও ছিল না। এই সব বাঙালী চিত্র-নির্মাতার পক্ষে একটা বড় অসুবিধা হল, এঁরা চলচ্চিত্র শিল্পকে যতটা শিল্প হিসাবে বিবেচনা করেছেন, সেই পরিমাণে ব্যবসা করার দিকে মনোযোগ দেননি। হিন্দি ছায়াছবির নির্মাতারা গোড়া থেকেই ব্যবসার কথাটা মনে ভেবেছেন। আর্ট নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি।

আরও একটা অসুবিধা দেখা দিল। ইতিমধ্যে এই শিল্পের কারিগরি দিকটা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার দৌলতে মাদ্রাজ ও বোম্বাই উন্নত মানের ষ্টুডিও গড়ে তুলতে পারল। টাকার অভাব হয়নি। কিন্তু এই কলকাতায় টাকার অভাবেই ষ্টুডিওগুলি বোম্বাই বা মাদ্রাজের তুলনায় সেকেলে হয়ে পড়ল। আগে যেখানে ১৫/১৬টি ষ্টুডিও ছিল টালিগঞ্জ পাড়ায়, এখন আছে মাত্র পাঁচ ছ'টি। আগে মাদ্রাজ থেকে ছবি করতে আসতো কলকাতায়। এখন কলকাতার কলাকুশলীদের ছুটতে হয় মাদ্রাজ অথবা বোম্বাইতে।

এইভাবে পশ্চিম বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প কারিগরি দিক থেকে পিছিয়ে পড়ল। বাঙালীরা নতুন করে অর্থ লগ্নী করতে পিছপা হল। দেশ বিভাগের পর ৬০ শতাংশ বাজার হাতছাড়া হল। তাছাড়া, রুচিরও পরিবর্তন ঘটল। বাংলা ছবির অর্থকরী সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে দুশ্চিন্তার আর একটি কারণ, বাঙালীরাই বাংলা ছবি দেখে কম। বাঙালীরা যে পরিমাণ হিন্দি ছবি দেখে, তার মাত্র ২৫ শতাংশ দেখে বাংলা ছবি। দু'চারটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সাধারণভাবে বাংলা ছবির দর্শকদের হিসাব এইরকমই। কলকাতায় যে ৯৫টি প্রেক্ষাগৃহ আছে, তার মধ্যে মাত্র ১৪টিতে নিয়মিতভাবে বাংলা ছবি দেখানো হয়। বাকি সবগুলিতেই চলে হিন্দি ছবি। সামান্য কয়েকটিতে ইংরাজী ছবি কখনও কখনও। মফঃস্বলেও এমনকি, বাঙালী অধ্যুষিত ছোট শহরেও এই একই চিত্র।

এখন বাংলা চলচ্চিত্র জগত প্রায় অবাঙালীদের দখলে। কেননা, শিল্পের প্রাণ যে টাকা, তার বড় জোগানদার এই অবাঙালীরাই। একথা ঠিক, বাংলা চলচ্চিত্রে

শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রায় সবাই বাঙালী। পরিচালক সকলেই বাঙালী। প্রযোজকদের বেশির ভাগই বাঙালী। সিনেমা হলের মালিকদেরও ৮৫ শতাংশ বাঙালী। সিনেমা হলের কর্মচারীরাও প্রায় সবাই বাঙালী। ছবি প্রদর্শনের দায়িত্ব যাঁদের, সেই পরিবেশকদের ৮০ শতাংশ কিন্তু অবাঙালী। আর এঁরাই আসল মালিক। এই পরিবেশকরা সকলেই ছদ্মবেশী মহাজন, অথবা মহাজনদের এঁরাই আসল কুশীলব।

এখন যেমন তেমন একটি বাংলা ছবি করতে গেলেও কয়েক লাখ টাকার বাজেট করতে হয়। বাংলা ছবির বাজার অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় অনেক বাঙালী প্রযোজককের পক্ষেই এই পরিমাণ টাকার সংস্থান করা সম্ভব নয়। তাঁদের হাত পাততে হয় পরিবেশক ওরফে মহাজনদের কাছে। বেশিরভাগ বাঙালী নামেমাত্র প্রযোজক, আসল প্রযোজনা করে অবাঙালীরাই। ছবি তৈরি হওয়ার পর তা প্রদর্শনের দায়িত্ব পরিবেশকদের। যেহেতু পরিবেশকরা বেশির-ভাগই অবাঙালী, এই পরিবেশকরা হিন্দি ছবি পরিবেশনার জন্য বহু টাকা লগ্নী করে থাকেন, যেহেতু পরিবেশকরা দ্রুত প্রদর্শনের মাধ্যমে লগ্নীকরা টাকা তুলে আনতে চান, সেইহেতু তাঁরা হিন্দি ছবি পরিবেশনার জন্যই বেশি আগ্রহী। ফলে, বাংলা ছবির মুক্তি বিলম্বিত হয়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য একসময় চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি অনেক আন্দোলন করেছে, আরও বেশি বাংলা ছবি দেখুন বলে প্রচার চালান হয়েছে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। হিন্দি ছবি প্রদর্শনে উপার্জন বেশি বলে সিনেমা হলের মালিকরাও অনেকে বাংলা ছবির বদলে হিন্দি ছবি নিতে আগ্রহী বেশি। অনেক সময় এই সিনেমা হলের মালিকরা হিন্দি ছবি নিতে বাধ্য হন। ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে সিনেমা হলের মালিকরাও অনেক সময় হাত পাততে বাধ্য হন অবাঙালী মহাজনদের কাছে। আর সেই সূত্রেই অলিখিত একটি শর্ত হিন্দি ছবি নিতে বাধ্য করা।

ভেষজ

ভেষজ শিল্পে বাঙালীর ভরাডুবির ইতিবৃত্ত একইসঙ্গে দুঃখের ও লজ্জার। স্বাধীনতার আগে এই শিল্পে ভারতে বাঙালীরাই ছিল সবার আগে, স্বাধীনতার পর দুই দশকের মধ্যেই বাঙালী এসে দাঁড়াল সবার পিছনে। স্বাধীনতার আগে সারা ভারতে বছরে ১০ কোটি টাকার ওষুধ তৈরি হত। এর মধ্যে বাংলায় বাঙালীরা তৈরি করত ৭৫ ভাগ। বাকিটা আমদানি করা হত বিদেশ থেকে আর এখন সারা ভারতে ১১০০ কোটি টাকার ওষুধ তৈরি হয় বছরে। তার মধ্যে এই বাংলায় তৈরি হয় মাত্র দশ শতাংশের মত। ভেষজ শিল্পে স্বাধীনোত্তর কালে এই যে বিপুল অগ্রগতি, তার ছিটেফোঁটাও জোটেনি বাংলার ভাগ্যে।

ভেষজ শিল্পে বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে। পেনিসিলিন, সালফার ড্রাগ, অ্যান্টি-বায়োটিক, টাইফয়েডের ওষুধ, যক্ষ্মা রোগের ওষুধ—সবই আবিষ্কৃত হয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বা তার পরে পরেই। এইসব আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানেও এল এক গুরুতর পরিবর্তন। রোগ সারাতে এসব ওষুধের কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত। বলাই বাহুল্য, উন্নত মানের আধুনিক ওষুধ তৈরির গৌরব বিদেশের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবং তার কিছু পরে ভারতের স্বাধীনতার পর ওষুধ তৈরির বিদেশী সংস্থাগুলি বাণিজ্যিক স্বার্থে-ই ভারতে এল নতুন নতুন ওষুধের সম্ভার নিয়ে। তারা চাইল ভারতে ওষুধ শিল্পোদ্যোগীদের সহায়তা নিয়ে যৌথ সংস্থা গড়ে তুলতে। তাদের প্রথম পছন্দ ছিল এই পশ্চিম বাংলা—যেহেতু ভেষজ শিল্পে বাংলা ছিল তখন ভারতে সবার শীর্ষে। কিন্তু তাদের হতাশ হতে হল। তখনকার বাঙালী ওষুধ নির্মাতা সংস্থাগুলি বিদেশী সংস্থাগুলিকে এই রাজ্যে স্থান দেয়নি।

উগ্র জাতীয়তাবাদ বাধা হয়ে দাঁড়াল। বাঙালী শিল্পোদ্যোগীদের বক্তব্য : আমরা স্বাধীন হয়েছি। বিদেশী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করব কেন ?

অন্যদিকে বোম্বাই ও গুজরাটের শিল্পপতিরা বিদেশী সংস্থাগুলিকে সাদর আহ্বান জানাল। একে একে গড়ে উঠতে লাগল আধুনিক ওষুধ তৈরির কারখানা। তারপর আস্তে আস্তে ওষুধ তৈরির কাঁচামাল (বেসিক ড্রাগ) বানানোর ব্যবস্থাও হল। এইসব ওষুধ অল্পদিনের মধ্যেই বাজার ছেয়ে ফেলল। রোগ সারাতে ডাক্তাররা নতুন নতুন এইসব ওষুধ ব্যবহার করতে লাগলেন। ফলে, বোম্বাই ও গুজরাটের ভেষজ শিল্প ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে লাগল। উন্নত ধরনের এইসব ওষুধ তৈরির জন্য অপরিহার্য কারিগরি বিজ্ঞান ক্রমে ভারতীয়রাও আয়ত্ত করতে লাগল। একদিকে কারিগরি বিজ্ঞান আয়ত্ত হল, অন্যদিকে বেশির ভাগ কাঁচামাল হাতের কাছেই পাওয়া যেতে লাগল। এই দুইয়ের যোগাযোগে ওই বোম্বাই ও গুজরাটেই ওষুধ তৈরির দেশি সংস্থাও গড়ে উঠল। এইরকম কোন ঘটনা কিন্তু বাংলায় ঘটল না। বাঙালীরা পুরোনো ওষুধপত্র তৈরিতেই আবদ্ধ হয়ে রইল। এর প্রধান কারণ, বাঙালীরা প্রতিষ্ঠানগত ভাবে আধুনিক ওষুধ তৈরির উন্নত মানের কারিগরি বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে পারল না সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছিল বলে। অন্য দিকে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সূত্রে পুরনো এইসব ওষুধের বেশির ভাগই অচল হয়ে পড়ল। অর্থাৎ, বাজার সংকুচিত হয়ে পড়ল। একে একে বড় মাপের সংস্থাগুলিও কার্যত পঙ্গু হয়ে পড়ল। অবস্থা এমনই সঙ্গীন হয়ে পড়ল যে, কর্মচারীদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এই বাংলার বড় বড় ৪টি সংস্থাকে সরকার অধিগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। দু-তিনটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান বিলম্বে হলেও এ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। তারা অল্পসল্প নতুন কারিগরি বিজ্ঞান আয়ত্ত করে কোনমতে টিঁকে থাকতে পেরেছে। বস্তুত, এরাই এখন বাংলার মুখ রক্ষা করে চলেছে। ছোট বড় মিলিয়ে এই রাজ্যে এখনও ৬০০ প্রতিষ্ঠান আছে। তারমধ্যে মাত্র গোটা তিনেক বড় মাপের। বাকি সবই ক্ষুদ্র শিল্প। আর ক্ষুদ্রশিল্পগুলিরও বেশিরভাগের

আসল মালিক গুজরাটিরা। একের পর এক ছোটখাটো প্রতিষ্ঠানগুলি উঠে যাচ্ছে, নয়ত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে অবাঙালীদের, বিশেষ করে গুজরাটিদের কাছে।

এখন এই রাজ্যের ভেষজ-শিল্প নির্মাতাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল কাঁচা মাল সময় মত পাওয়া যায় না। কাঁচামালের জন্য হাত পাততে হয় বোম্বাই-য়ের কাছে। ওখানে যে কাঁচামাল তৈরি হয়, তা ওখানকার শিল্পের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে, তবেই তা বাংলা বা অন্য রাজ্য পাবে। ফলে কাঁচা মাল সহজে মেলে না। সুনির্দিষ্ট দামে মেলে না। উপরন্তু, বোম্বাই থেকে আনার খরচ বেশি। অগত্যা বোম্বাই বা গুজরাটের সংস্থাগুলির চেয়ে বাংলার তৈরি ওষুধের নির্মাণ ব্যয় বেশি পড়ে, লাভের পরিমাণ কমে যায়। কখনও কখনও লোকসানও গুনতে হয়। কেন না, ওষুধের দাম সরকার বেঁধে দিয়েছেন। দাম বাড়ানোর উপায় নেই।

ভেষজ শিল্পে এই রাজ্যের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য তদানীন্তন রাজ্য সরকারও কম দায়ী নন। তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বিশ্বখ্যাত চিকিৎসক। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও উন্নতমানের ওষুধ সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন না, এমন কথা বলার মত মূর্খ কেউ নেই। তবু, কী এক অজ্ঞাত কারণে, তিনি এবং তাঁর সরকারী আমলারা কেউই ভেষজ শিল্পের এই পট পরিবর্তনের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি বা বুঝতে চাননি। আধুনিক ভেষজ শিল্প গড়ে তোলার কোন চেষ্টাই তখন হয়নি।

এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও আচরণ নিঃসন্দেহে পক্ষপাতমূলক। তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী মনুভাই শাহ একচক্ষু হরিণের মত কেবল আরব সাগর তীরেই নজর দিয়েছেন। অথচ ভারতের ভেষজ শিল্পের অগ্রদূত এই বাংলার জন্য তিনি কিছুই করতে পারেননি। এমন ঘটনাও ঘটেছে, কোন বিদেশী সংস্থাকে দিল্লির প্রভাবশালী মহল আগেভাগেই জানিয়ে দিত, বোম্বাই বা গুজরাটে কারখানা করতে চাইলে তবেই অনুমতি দেওয়া হবে। পরেও

এই নীতির পরিবর্তন হয়নি। সেই বিধান রায় বা সেই মনুভাই শাহ এখন নেই। কিন্তু কেন্দ্রের সেই দৃষ্টিভঙ্গী আজও অম্লান। আই ডি পি এল একটি কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা। এই সংস্থা মূলত কাঁচামাল বা বেসিক ড্রাগ তৈরি করে থাকে। হৃষীকেশ, গুরগাঁও, হায়দরাবাদ, বেতিয়া—বিভিন্ন জায়গায় এর ইউনিট আছে। পশ্চিমবাংলায় নয় কেন? অনেক জল ঘোলা করার পর একটি ইউনিট এই রাজ্যে করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু, আজও পর্যন্ত তা হয়নি। সর্বশেষ সংবাদ: পশ্চিম বাংলা বাতিল। তার বদলে হায়দরাবাদের ইউনিট-টিকেই সম্প্রসারিত করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার সুসম শিল্পনীতির কথা বলে থাকেন। এই কি তার নমুনা?

বাঙালী কোথায়?

কে কী বলেন?

দুই ঐতিহাসিক
দুই রাজনৈতিক নেতা
শিল্পপতি, শ্রমিক নেতা
দুই উপাচার্য
বিচারপতি, প্রশাসক
শিল্পপতি, আই. জি
দুই ট্রেড ইউনিয়ন নেতা
দুই মন্ত্রী
সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ
বাজোরিয়া, সিংহানিয়া
সাহিত্যিক, সাংবাদিক
অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ

দুই ঐতিহাসিক

ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে বাঙালীরা ক্রমেই পিছু হটছে কেন—এই প্রশ্ন রেখে-ছিলাম দুই ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের কাছে। দু'জনেই মনে করেন, এর জন্য বাঙালীরা নিজেরাই দায়ী। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প গড়ে তোলা বা তা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেসব গুণ থাকা দরকার বাঙালীর স্বভাবে ও চরিত্রে তা নেই। নীহারবাবু এই বিষয়টিকে আরও তীক্ষ্ণ-ভাবে বলেছেন : বাঙালীর চরিত্রের দোষ। প্রতুলবাবু তার চেয়ে একটু মোলায়েম করে বল্লেন : সার্বিক অক্ষমতা।

নীহারবাবু অবশ্য গোড়াতেই একটা পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন : এখন পিছিয়ে পড়ছে কথাটার মানে কী ? বাঙালী ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পে এগিয়েই বা ছিল কবে ? অগত্যা উনিশ শতকে বাঙালীর শিল্পোদ্যোগের কিছু নজির আমাকে পেশ করতে হল। তার উত্তরে নীহারবাবু বলেন, ওটা উদ্যোগ মাত্র। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এসে গেল। বাঙালীরা জমি কিনে জমিদার হয়ে বসলেন। জমি থেকে আয় সুনিশ্চিত এবং অনেক বেশি নিরাপদ। সেই ধারাবাহিকতা আজও চলছে। আজও বাঙালীদের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প গড়ে তোলার ঝুঁকি নেওয়ার বদলে নিশ্চিত ও নিরাপদ আয়ের দিকেই ঝোঁক বেশি। ঝুঁকি নিতে পারার মানসিক শক্তি বাঙালীর নেই। কারখানার মালিক হওয়ার চেয়ে আপিসের কেরাণী হওয়াতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বেশি।

প্রতুলবাবুও ওই একই কথা বলেছেন। দু'একজন উজ্জ্বল ব্যতিক্রমও আছেন। তাঁরা কিছু গড়েও তুলেছেন। কিন্তু তা দীর্ঘায়ু হয়নি। এর কারণ হিসাবে নীহারবাবু বল্লেন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি বাঙালীর আর একটি চরিত্র-দোষ। প্রতুলবাবু বল্লেন, বাঙালীরা দুটো পয়সার মুখ দেখলেই পরস্পর ঈর্ষাকাতর হয়ে

পড়ে। ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প যাই বলুন, শেষ পর্যন্ত তা পারিবারিক বা অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর সব কলহেরই পরিণাম শোচনীয়। হয়েছেও তাই।

দু'জনেই মনে করেন, পুঁজি থাকা না থাকাটা কোন বড় ব্যাপার নয়। পুঁজি থাকলেও বাঙালী তা ব্যবসায় লগ্নী না করে ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করতে বেশি আগ্রহী। আসলে বাঙালীরা শ্রমবিমুখ। ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প গড়ে তুলতে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়, বাঙালীরা তা করতে চায় না। বা পারে না। নীহারবাবু বল্লেন, আমরা খাটতে চাই না। খাটতে যাতে না হয়, আমাদের ঝোঁক সেদিকেই। প্রতুলবাবু মনে করেন, বাঙালীদের কাজে আঁঠা নেই। লেগে থাকতে জানে না। পরিশ্রমে অনীহা। কম পরিশ্রমে আপিসের কাজ হয় (সেইরকমই তো চলছে) কিন্তু কারখানা চলে না।

বাঙালীর পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নীহারবাবু আরও কিছু কথা বলেছেন। তাঁর মতে বাঙালী মাত্রেই বাবু। আগে ছিলেন বাবু এখন হয়েছেন সাহেব। যে বাবু একটি ব্যবসা বা শিল্প গড়ে গেলেন, তা চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পড়ল তাঁরই সন্তানের উপর। তিনি সাহেব। ব্যবসা বা শিল্পের কিছুই জানেন না কিন্তু সাহেবিয়ানায় উত্তম। ফলে ব্যবসা বা শিল্প মাটি হয়। কোন কিছু গড়ে তোলার পক্ষে বাবুয়ানি বা সাহেবিয়ানা—দুই-ই বড় বাধা। প্রতুলবাবুর মতে দোকানদারি বা ওই ধরনের ছোটখাটো ব্যবসার পক্ষেও বাঙালী তেমন উপযুক্ত নয়। বাঙালীর স্বভাব ও আচরণ এর বড় প্রতিবন্ধক। বাঙালীর মধ্যে, তার মতে, একদিকে যেমন তৎপরতার অভাব লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে ধৈর্যের অভাবও বড় বেশি। বাঙালী দোকানদাররা খদ্দেরের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে এটা সুবিদিত। অথচ পাশেই অবাঙালী দোকানদারের আচরণ একেবারে বিপরীত। ফলে, এই কলকাতা শহরেই বাঙালীর দোকানের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষণা সত্বেও ওই একটি মাত্র কারণে অবাঙালী হকাররাই লাভবান হচ্ছে বেশি।

দুই ঐতিহাসিক মনে করেন, স্বাধীনোত্তরকালে পশ্চিম বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রসারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের অভিযোগ সত্য নয়। তবে রাজ্য সরকারের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে দু'জনের দু'মত। নীহারবাবু মনে করেন, রাজ্য সরকার কিছু সুযোগসুবিধা দিতে পারেন—এই পর্যন্ত। কিন্তু বাঙালীর মানসিকতার পরিবর্তন বা চরিত্রের শুদ্ধি ঘটাবেন কী করে রাজ্য সরকার? তারপরেই বললেন, কেউ সাহায্য করে কিছু করতে পারবেন না—যদি না নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে পারেন। প্রতুলবাবু মনে করেন, এ-ব্যাপারে রাজ্য সরকারের একটা দায়িত্ব ছিল। সে দায়িত্ব আজও ভালভাবে পালন করা হয়নি।

দুই রাজনৈতিক নেতা

একদিকে গোলামী রোগ, অন্যদিকে বাবুয়ানা—এই দুই কারণে বাঙালীরা ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পে পিছিয়ে পড়েছে। যা হাতে ছিল, তাও ধরে রাখতে পারেনি। এই অভিমত প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের। মার্কস্‌বাদী নেতা সি পি আই এম দলের সরোজ মুখোপাধ্যায় আদপে স্বীকারই করেন না যে বাঙালীরা পিছিয়ে পড়ছে। তবে, তিনি মনে করেন, বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে আসামে বাঙালী সংখ্যালঘুরা যে অত্যাচারিত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ-মুখর হওয়া প্রয়োজন।

প্রফুল্লবাবু মনে করেন, এক সময় আসাম ওড়িশা বিহার প্রভৃতি রাজ্যে আমরা শিক্ষক, ডাক্তার, প্রশাসক হয়ে গিয়েছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে সেসব জায়গায়

থেকে গিয়েছি। এখন সেইসব রাজ্যের মানুষের মনে আমাদের সম্পর্কে একটা বিরুদ্ধভাব দেখা গিয়েছে। বর্তমানে বাঙালীদের বিরুদ্ধে অন্য রাজ্যে যে আন্দোলন, এটাই তার মূল কারণ। ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্পে আগেও বাঙালীরা খুব কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। একেবারে গোড়ায় শুরু করলেও পরে বাঙালীরা জমিদার হয়ে বসল। সেই থেকে বাঙালী "বাবু"। এই বাবুয়ানার অন্তর্গত রেশ এখনও চলছে। জমিদারি যখন চলে গেল, তখনও আমরা ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্পে তেমন করে ফিরে যেতে পারলাম না। তিনি কয়েকটি নজিরও তুলে দেখান, স্বাধীনতার পর নতুন করে চেষ্টা যে, না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সাফল্য আসেনি।

প্রফুল্লবাবু দীর্ঘদিন মন্ত্রীত্ব করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম—সরকারের তো এব্যাপারে একটা দায়িত্ব ছিল। তা কি সঠিকভাবে পালন করা হয়েছে? উত্তরে প্রফুল্লবাবু বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্বের সঙ্গে জনগণের দায়িত্ব যুক্ত হওয়া উচিত। এই রাজ্যে দুটো এক হয়নি। হলে যে উন্নতি হয়, তার প্রমাণ পাঞ্জাব, হরিয়ানা। আসলে, ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প গড়তে গেলে নিজস্ব উদ্যোগ থাকা চাই। বাঙালীদের তা নেই। বাঙালী চাকরি করতে ভালবাসে। গোলামি প্রবৃত্তি আমাদের এখনও রয়ে গিয়েছে। এটা বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কোন সরকার চরিত্র তৈরি করতে পারে বা সংশোধন করতে পারে বলে তো শুনিনি। এখন উপরতলায় বাঙালী নেই, নীচেও নেই, মাঝখানে ত্রিশঙ্কুর মতো আমরা ঝুলে আছি।

সরোজবাবু "বাঙালী" শব্দে আপত্তি জানিয়ে বলেন, আপনারা যেভাবে বাঙালী বাঙালী করছেন, এটা আমরা সঠিক মনে করি না। বাঙালীদের অভিযোগ অনেক আছে সত্য কিন্তু আমরা বাঙালী, বিহারী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, অসমীয়া—এভাবে সমস্যাগুলো বিচার করি না। আমরা সবাই ভারতীয়। দীর্ঘ জাতীয় আন্দোলনের পরিণতিতে এই জাতীয় ঐক্য ও ভারতীয় অখণ্ডতা গড়ে উঠেছে।

বাঙালীরা পিছিয়ে আছে, আমি তা মনে করি না। এটা শুনেছি, বাঙালী কর্মচারীরা দিল্লিতে প্রমোশন পান না, উঁচু পদে উঠতে পারেন না, ব্যবসায় সুবিধা করতে পারেন না। অন্যরা নাকি বাঙালীদের প্রতি একটু উন্নাসিক মনোভাব দেখান। খুব গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, সব ভাষা-ভাষী লোকের মধ্যেই এই ধরনের অভিযোগ আছে। মার্কসবাদীদের বিশ্লেষণে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এরকমই ঘটে থাকে। সব ভাষাভাষীর মধ্যেই শোষণকারী, অত্যাচারী ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা আছে। তাদের সকলের বিরুদ্ধেই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে। শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক-টাই বিশেষ করে বিচার করতে হবে।

তবে, সরোজবাবু বলেন, বাঙালী সংখ্যালঘু হিসাবে বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে আসামে যে অত্যাচারিত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ-মুখর হওয়া প্রয়োজন। সংখ্যালঘুদের অধিকার সংবিধানে সুরক্ষিত থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকার তা কঠোরভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করছে না। কলকাতা বা এই রাজ্যের শিল্পাঞ্চলে বাঙালীর চেয়ে অবাঙালী কর্মীর সংখ্যা বেশি। এতে আমাদের ক্ষোভের কোন কারণ থাকতে পারে না। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুব বেশি অগ্রসর। জাতীয় আন্দোলনে বাঙালীরা বরাবরই বামপন্থার দিকেই ঝুঁকে এসেছে। সেই কারনেই, এই রাজ্যে অবাঙালীদের প্রতি আমাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষের ভাব দেখা যায় না। পরস্পরের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদপন্থী প্রতি-ক্রিয়ার শক্তি আপ্রাণ চেষ্টা করেও পশ্চিমবঙ্গে বারে বারে পরাজিত হয়েছে। আজও পরাস্ত। বাঙালী জাতির উদারতা, হার্দিক প্রসারতা সব কিছু সঙ্কীর্ণতাকে ধূলিসাৎ করে দেয়। এবং মহান জাতীয় ঐক্যের পথ সুগম করে। আমরা সুনিশ্চিত এই জাতীয় ঐক্য আরও মজবুত হবে। একে ভাঙ্গার সাধ্য কারও নেই।

শিল্পপতি, শ্রমিক নেতা

একজন শিল্পপতি ও একজন শ্রমিক নেতা অন্ততঃ একটি বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছেন। ও'রা তু'জনেই মনে করেন, ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি অনেক সময়ই অযৌক্তিক দাবি দাওয়া করে থাকে। এর ফলে এই রাজ্যে শিল্পের প্রসার অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। একমত হলেও তু'জনের ব্যাখ্যা কিন্তু তু'রকম। শিল্পপতি সঞ্জয় সেন মনে করেন, দাবি-দাওয়ার সঙ্গে উৎপাদনশীলতাকে যুক্ত করা উচিত। এ-সব বিবেচনা না করেই শ্রমিকরা বহু ক্ষেত্রে অযৌক্তিক দাবি-দাওয়া করে থাকে। শ্রমিক নেতা মহম্মদ ইলিয়াস বলেন, বহু ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলে, কোন শ্রমিক সংস্থাকে একটি শিল্প থেকে হটিয়ে দিতে অনেক সময় অন্য একটি শ্রমিক সংস্থা অযৌক্তিক দাবী-দাওয়া তুলে শিল্পে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে।

এ ছাড়াও, শিল্পে বাঙালীর পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে সঞ্জয়বাবু মনে করেন, স্বাধীনতার পর বাংলায় মূলধনে ঘাটতি পড়ে। এই রাজ্যে বড় বড় শিল্পের মালিকানা বেশির ভাগই ছিল ইংরেজদের হাতে। তাদের চেষ্টা ছিল শিল্প থেকে লাভের টাকা পুনর্বিনিয়োগ না করে তা স্বদেশে নিয়ে যাওয়া। এইভাবে বাঙালীর হাতে মূলধন নিয়োগের মত পর্যাপ্ত টাকা ছিল না। অন্যদিকে বোম্বাই, আমেদাবাদের শিল্পপতিরা সকলেই অবাঙালী। তাঁদের শিল্প থেকে অর্জিত লাভের টাকা তাদের হাতেই থেকে গিয়েছে। ফলে, দেশ বিভাগের পর সেই টাকার জোরে অবাঙালীরাই, এই বাংলাতেও শিল্পের মালিক হয়ে বসল।

/দেশ বিভাগের পর সব রাজ্যেই নতুন করে শিল্প গড়ার জোর চেষ্টা শুরু হল। রাজ্য সরকারগুলিই উদ্যোগী হল। পশ্চিম বাংলায় ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটল।

বরং, ওই সময় যে-সব বাঙালী নতুন শিল্প গড়ার জন্য পরিকল্পনা পেশ করেছিল, রাজ্যসরকার থেকেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা খারিজ করা হল। সঞ্জয়বাবু সরাসরি অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন অর্থলগ্নী সংস্থাগুলির প্রায় সব কয়টিরই সদর দপ্তর বোম্বাই ও দিল্লিতে। পশ্চিমবাংলায় আছে তার শাখা অফিস। শাখা অফিসের দশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করার ক্ষমতাও নেই। স্বভাবতই অবাঙালীরাই এই সব সংস্থা থেকে বেশির ভাগ সাহায্য পেয়েছে। আর একটি কারণ, বাঙালীর অহং বুদ্ধি। বাঙালী মনে করে, তার কিছু শেখবার নেই। সে অন্যকে শেখাবে। তার কিছু জানবার নেই। অন্যদের চেয়ে সে বেশি বোঝে, বেশি জানে। এই অহং বুদ্ধি বাঙালীর মানসিকতাকে পঙ্গু করে তুলেছে।

ইলিয়াস সাহেবের মতে, বাঙালীর হাতে পুঁজি নেই। ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারেও বাঙালীর চেয়ে অবাঙালীরাই বেশি সুযোগ পায়। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, যে কারণে বাঙালীর আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে, সেই কারণেই অবাঙালীদের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আর, এই ধরনের বৈষম্য-মূলক আচরণে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তাব্যক্তিদের পরোক্ষ সমর্থন থাকে। শ্রমিক হাঙ্গামার অভিযোগ ঠিক নয়। দাবিদাওয়া নিয়ে শ্রমিক আন্দোলন ভারতের সব জায়গাতেই আছে। অন্যত্র তো বাঙালী নেই! আসলে শ্রমিক হাঙ্গামার জন্য দায়ী মালিকরাই। একাধিক শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে বিরোধ জীইয়ে রাখা মালিকদের একটি নীতি। যেখানে এরকম ঘটনা ঘটে না, সেখানে অশান্তিও নেই। এমন নজির তো এই রাজ্যেই আছে।

ইলিয়াস সাহেব বলেন, স্বাধীনতার আগে শ্রমিকদের প্রত্যাশা ছিল, দেশ স্বাধীন হলে তাদের সুবিধা হবে। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। মালিকরা মুনাফা করেছে যে হারে, শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য দেয়নি তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। এতে শ্রমিক অসন্তোষ বেড়েছে। কিন্তু তাই বলে শ্রমিকদের দেশপ্রেম সম্পর্কে কোন সন্দেহ করা চলেনা। ১৯৬২ সালের যুদ্ধের সময় এই শ্রমিকরাই ৬০০

কোটি টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করেছে। ইলিয়াস সাহেব মনে করেন বাঙালীর ব্যবসা বানিজ্য ও শিল্পে পিছিয়ে পড়ার আর একটি বড় কারণ হল, বাঙালীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব। বিশেষ করে, উচ্চপদে আসীন তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বাঙালীর কাছ থেকে, শিল্পোদ্যোগী তরুণ বাঙালীরা কখনই কোন সহযোগিতা, সহানুভূতি পায়নি।

দুই উপাচার্য

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী দায়িত্বজ্ঞানহীন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শিল্পে বাঙালীর পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ বলে মনে করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দারের অভিমত, বাঙালীদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প গড়ার মত মানসিকতা কখনও ছিল না, পরেও গড়ে ওঠেনি।

মণীন্দ্রবাবু বলেন, শিল্পে বা বাণিজ্যে নানা রকম অসাধুতার ব্যাপার আছে। স্বভাবগুণে বাঙালীরা অবাঙালীদের মত অসাধুতা করতে পারে না। সরকারী মহলে কাজ গুছিয়ে নেওয়ার জন্য চালু আছে নানারকম ব্যবস্থা। খাতিরের বন্দোবস্ত। বাঙালীরা এসব করতে তেমন পোক্ত নয়। এসব করতে গেলে, যে ধরনের 'বাস্তব বুদ্ধির' দরকার হয়, বুদ্ধিমান বাঙালীর তা

নেই। শিল্প পরিচালনায় বাঙালীর প্রতিভা কম নয়। বিভিন্ন শিল্পে পরিচালক হিসাবে বাঙালীর কৃতিত্বই তার প্রমাণ। কিন্তু সেই কৃতী বাঙালীই নিজে শিল্প গড়তে গিয়ে অসফল হচ্ছে। ওই একই কারণ, অসাধুতার সঙ্গে বনিবনা হয় না।

মণীন্দ্রবাবু বলেন, এই রাজ্যে দশ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে আট লক্ষই অবাঙ্গালী। এ রাজ্যে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বে আছে বাঙ্গালীরাই। বাঙ্গালী মালিকরা শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার ব্যাপারেও দক্ষতা দেখাতে পারে না। কিন্তু মাড়োয়ারিরা এসব সহজেই 'ম্যানেজ' করে ফেলতে পারে। মাড়োয়ারি বিশেষ করে বিড়লার কারখানায়, এখানে তাই ধর্মঘট হয় কম। আবার বাঙ্গালী অধ্যুষিত কলে কারখানায় ধর্মঘট হয় বেশি। দায়িত্বজ্ঞানহীন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এই রাজ্যে শিল্প প্রসারে অনেক বিপত্তি ঘটিয়েছে। দাবিদাওয়ার অন্দোলনের সঙ্গে উৎ-পাদনের প্রশ্নটি যুক্ত হওয়া উচিত। দেখা দরকার, উৎপাদন যথেষ্ট হয় কি না। উৎপাদনের সূত্রে আয় থেকে অতিরিক্ত বেতন দেওয়া সম্ভব কি না। এসব কথা প্রায় ক্ষেত্রেই ভাবা হয় না।

বাঙ্গালীদের পক্ষে পুঁজি যোগাড় করা, ঋণ সংগ্রহ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। কারণ, অতিরিক্ত সুদের ভার বইবার ক্ষমতা বাঙ্গালীর নেই। অবাঙ্গালীদের সে ক্ষমতা আছে। তাদের নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতাও বেশি। রাজ্য সরকারও এই রাজ্যে শিল্প প্রসারে এতদিন গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা নিতে পারেনি। অন্য রাজ্যে তা হয়েছে। এই রাজ্যেই ইলেকট্রনিক শিল্পের সূত্রপাত, কিন্তু রাজ্য সরকারের আগ্রহ ও চেষ্টা না থাকায় এই রাজ্যে এই শিল্পের প্রসার ঘটল না। ঘটল কেরল ও মহারাষ্ট্রে।

রমেন্দ্রবাবু অবশ্য গোড়াতেই বাঙ্গালীর পিছিয়ে পড়ার প্রশ্নে একটু আপত্তি তোলেন। তিনি বলেন, বাঙ্গালী তো কোন কালেই এ ব্যাপারে এগিয়ে

ছিল না। সেই সিরাজদৌল্লার আমলেও ব্যবসা করত জগত শেঠ আর উমিচাঁদ। এদের একজন রাজস্থানী' অন্যজন পাঞ্জাবী। এরপর ইংরাজ আমলে বাঙ্গালী মগজশিল্পের পরিচর্যা করেছে। ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পে ব্যতিক্রমভাবে দু'একজন খ্যাতি অর্জন করলেও সাধারণভাবে বাঙ্গালীরা এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। ফলে বাঙ্গালীদের মধ্যে কোন বণিক সমাজ বা শিল্পপতিদের সম্প্রদায় গড়ে ওঠেনি। ফলে, বাঙ্গালীদের কোন ঐতিহ্য নেই এ ব্যাপারে। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার পরেও বাঙ্গালীদের মধ্যে নতুন করে ব্যবসা বা শিল্প সংগঠনের কোন তৎপরতা তেমন দেখা যায়নি।

রমেন্দ্রবাবু এই সঙ্গে বলেন, বাঙালীর সমাজচিন্তায় ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠা কোনদিনই তেমন করে চিহ্নিত হয়নি। ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিরা বরাবরই খুব একটা সম্মানীয় বলে স্বীকৃতি পায়নি। সেই চিন্তাধারা আজও ভেতরে ভেতরে কাজ করছে।

স্বাধীনোত্তর কালে এই রাজ্যে শিল্প প্রসারের প্রতিবন্ধকতা হিসাবে রমেন্দ্রবাবু অতিরিক্ত মাত্রায় কেন্দ্রনির্ভরতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, যে কোন শিল্প গড়ে তুলতে চেষ্টা করা হোক না কেন, পদে পদে কেন্দ্রের দ্বারস্থ হতে হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবে শিল্প গড়ার প্রচেষ্টাও পদে পদে ব্যাহত হয়। ওভার সেণ্ট্রালাইজেশন একটা বড় বাধা।

রমেন্দ্রবাবু অবশ্য বাঙালীদের কিছু ক্রটির কথাও বলেন। তাঁর মতে বাঙালীরা ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে না। তার চেয়ে বাধা মাইনের চাকরি পছন্দ করে। নিশ্চিন্ত আয়ে সন্তুষ্ট বাঙালী অন্য সময়ে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া চিন্তাচর্চায় মনোনিবেশ করে স্ফূর্তি লাভ করে। এটা বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য, যেমন গুজরাটি মাড়োয়ারিদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ব্যবসা বাণিজ্য করা বা কল-কারখানা বসানো।

বিচারপতি, প্রশাসক

ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে বাঙালী ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। এর কারণ কী? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন প্রাক্তন প্রশাসক ও একজন প্রাক্তন বিচাপতির মতে অন্যান্য কারণ ছাড়া, সরকারও সমান দায়ী। অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস অফিসার ও প্রাক্তন প্রশাসক শরদিন্দু দত্ত মজুমদার মনে করেন, স্বাধীনতার পর ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে বাঙালীদের উৎসাহী করে তুলতে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। এতদিন ধরে এসম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি এস এ মাসুদের মতে, ১৯৪৭ সালের পর সরকারের দুর্বলতাই বাঙালীর অগ্রগতির পরিপন্থী। নতুন প্রজাতির জন্য কোন সুযোগ সৃষ্টি করা হয়নি।

বাঙালীরা ঝুঁকি নিতে চায় না, পরিশ্রম করতে চায় না ইত্যাকার প্রকৃতিগত দোষগুলি স্বীকার করে নিয়েও শরদিন্দুবাবু বলেন, স্বাধীনতার পর সব রাজ্যেই নতুন করে সুযোগ এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এর জন্য সরকারের উচিত ছিল উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার। বাঙালীদের উৎসাহ দেওয়ার। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পর ১৯৬২ সাল থেকে পনের / ষোল বছর ধরে বড় বড় বক্তৃতা হয়েছে, বহু প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু আসল কাজ হয়নি। মহারাষ্ট্রে মহারাস্ট্রী শিল্পপতির সংখ্যা হুহু করে বেড়েছে। বাংলায় তেমন হয়নি। শরদিন্দুবাবু বলেন, সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হয়েছে, তাও পেয়েছে বেশিরভাগ অবাঙালীরাই। সরকারের উদ্যোগে যে সব অর্থ বিনিয়োগ সংস্থা গড়ে উঠেছে, সেগুলি আসলে রাজনৈতিক দলের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। ফলে, কখনই সুবিচার হয়নি। এইসব সংস্থা দুর্নীতির আখড়াতে পরিণত হয়েছে। টাকার জন্য গেলেই প্রথম প্রশ্ন : কত টাকা খরচ করতে পারবেন? বেশির ভাগ বাঙালীই ওই টাকা খরচ করতে

পারে না বা রাজি নয়। অবাঙালীরা কিন্তু এই টাকা খরচের ব্যাপারটা ধরে নিয়েই এগোয়। সরকারী অফিসে কাজের নমুনাও কারো অজানা নয়। টাকা বা লাইসেন্স আদায়ের জন্য ঘুরতে ঘুরতে জুতো ক্ষয়ে যায়। বাঙালীরা এক জোড়া জুতো খুইয়ে আর এগোয় না। অবাঙালীরা আগেই দু'তিন জোড়া জুতো কিনে তৈরি হয়ে তারপর সরকারী অফিসে হাঁটাহাঁটি শুরু করে। সরকারী মহলের এসব ত্রুটি বিচ্যুতির কথা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও তার প্রতিকার হয় না।

মাসুদ সাহেব মনে করেন, সরকারের বড় ত্রুটি—ব্যাপক দুর্নীতি ও কাজে গাফিলতি। অন্যান্য রাজ্যের লোকেরা নতুন করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প গড়ে তোলায় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে যে পরিমাণ উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছে, বাঙালীরা তা পায়নি। বহু শিক্ষিত ছেলেও ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্প গড়তে ইচ্ছুক। কিন্তু সময়মত লাইসেন্স পাওয়া, সময়মত টাকা পাওয়া, সময়মত কাঁচামাল পাওয়া—কোনটাই হয়ে ওঠে না। ঘুষ আর দুর্নীতির পাহাড় ঠেলে কিছু একটা গড়ে তুলতে গিয়ে বাঙালীদের আর দম থাকে না। কাঁচামাল সরবরাহ করে বেশির ভাগই অবাঙালী, কাঁচামালের কোটা পায় অবাঙালী। এই দুইয়ের মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়া। মার খায় বাঙালীরা।

বাঙালীরা কর্মবিমুখ—এই অভিযোগ মাসুদ সাহেব স্বীকার করেন না। হাওড়া বা শিয়ালদহে কুলি অবাঙালীরা। কিন্তু মফঃস্বলের স্টেশনে কুলি মাত্রেই বাঙালী। কলকাতার রিক্‌শাওয়ালারা একচেটিয়া অবাঙালী। কিন্তু মফঃস্বলে বাঙালীরাই রিকশা চালায়। কাজেই শ্রমসাধ্য কাজে পিছ পা নয়। নিজেদের দোষকে বড় করে দেখিয়ে সমালোচক সাজার অর্থ আত্মপ্রতারণা। আসলে, সরকার আন্তরিকভাবে চাইলে বাঙালীরা এখনও ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের অভিযোগ সম্পর্কে দু'জনে ভিন্নমত। শরদিন্দুবাবু মনে করেন না, কেন্দ্রের কোন সরাসরি ভূমিকা আছে এ ব্যাপারে।

তবে কেন্দ্রে পশ্চিমবাংলার লবি নেই। এর ফলে অনেক সময়ই পশ্চিমবাংলা তার ন্যায্য পাওনা আদায় করতে পারেনি। মাসুদ সাহেব কিন্তু মনে করেন কেন্দ্রীয় সরকারেরও কিছু দায় দায়িত্ব আছে। তাও সঠিকভাবে পালন করা হয়নি। কেন্দ্রে বরাবরই বাঙালী মন্ত্রী বা বাঙালী অফিসারের সংখ্যা কম। কোটা, পারমিট, লাইসেন্স এসব আদায় করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সুবিধা করতে পারে নি। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব হরিয়ানা, এমনকি দক্ষিণী রাজ্যগুলি পর্যন্ত এতদিন যে সুবিধা পেয়ে এসেছে, পশ্চিমবাংলা তা পায়নি। এ সব যদি জনসংখ্যার বিচারে বণ্টন করা হত, তাহলে হয়ত অবিচার হত না।

শিল্পপতি, আই. জি

বাঙ্গালী পারে না, এ কথা ঠিক নয়। বলা যায়, স্বাধীনতার পর পারেনি। তার পেছনে আছে নানা কারণ। ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পে বাঙালীর পিছিয়ে পড়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দু'জনেই এইভাবে শুরু করেছিলেন। এঁরা হলেন অবসরপ্রাপ্ত আই পি এস, প্রাক্তন আই জি পুলিশ সুনীল চৌধুরী ও শিল্পপতি অমিতাভ পাল চৌধুরী। দু'জনেই মনে করেন, দেশ বিভাগ বাঙালীর অগ্রগতির পথে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

অমিতাভবাবুর ভাষায়, দেশ বিভাগেই বাঙালীরা ডুবে গেল। তখন কেবল জনসংখ্যার চাপ নয়, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির উপরও প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ে। একটা শিথিল অবস্থা। দু'চারজন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা ছিলেন পূর্ববাংলার অধিবাসী। দেশ বিভাগের পর ওইরকম

এলোমেলো অবস্থায় ওঁরা কেউই আর বড়রকমের কোন ঝুঁকি নেননি। যেসব শিল্প এখানে আগে থেকেই ছিল বাঙালীদের হাতে, তাঁরাও ওই পরিবেশে অনেকটা সংযত হয়ে পড়লেন। অন্যদিকে উদ্বাস্তু সমস্যা প্রপীড়িত ব্যতিব্যস্ত সরকারের কাছ থেকেও বড় রকমের কোন আশ্রয় মেলেনি। এই অবস্থায় সাহেবরা একের পর এক শিল্প সংস্থা বিক্রি করতে শুরু করল। বেশি দাম দিয়ে তা কিনে নিতে লাগল অবাঙালীরা—বিশেষ করে মাড়োয়ারি ও গুজরাটিরা। কেনাবেচার প্রতিযোগিতায় কম পুঁজির বাঙালীরা পেরে উঠল না। যাদের পুঁজি ছিল, তারাও পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে সাহস করে এগিয়ে গেল না। ফলে, শতকরা ৭০ ভাগ চা বাগান কিনল অবাঙালীরা। কয়লা শিল্পে থাবা বসালো অবাঙালীরা। পাট শিল্পেও। আর ছোট বড় সবরকম ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেও গরিষ্ঠ অবাঙালীরা। আর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল বাঙালী ছোট ব্যবসায়ীরা। আসল মার এখানেই।

এই বিষয়টি অমিতাভবাবু সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, সব সময়ই দেখা গিয়েছে ছোট ব্যবসায়ী শ্রেণী থেকেই কেউ কেউ পরে শিল্প গড়েছেন। অর্থাৎ ফ্রম ট্রেডিং টু ইণ্ডাস্ট্রি। ছোট ব্যবসায়ী বলতে বোঝাচ্ছি সেই শ্রেণীকে, যারা দীর্ঘদিন ধরে সাহেবদের শিল্পে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করে এসেছে। স্বাধীনতার আগে এই সাপ্লাইয়ের কাজে বাঙ্গালীরাই ছিল একচেটিয়া। স্বাধীনতার পর অবাঙালীরা একের পর এক সাহেব কোম্পানী কিনে নিয়ে নিজেদের জাতের লোকদের সাপ্লাইয়ার নিযুক্ত করতে লাগল। বাঙালীরা বাতিল হতে লাগল। আস্তে আস্তে বাঙালীদের এই কম্যুনিটিকে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল। এদের অনেকেই শিল্প গড়তে পারত, তার আর সুযোগ রইল না। বাঙালীদের এই ক্ষতি আজও পূরণ হয়নি, অদূর ভবিষ্যতেও হবে কি না, তা বলা যায় না।

বাঙালীর ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলিরও অবদান কম নয়। স্বাধীনতার পর এরা তারস্বরে একটা কথাই প্রমাণ করতে লাগল, ব্যবসায়ী মানেই চোর। শিল্পে উৎসাহ দেওয়ার বদলে বাঙালীদের মানসিকভাবে

অসুস্থ করে তোলার আয়োজন হল। সরকার পদে পদে বাধার সৃষ্টি করতে লাগল। অমিতাভবাবু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন না হলে শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হয় না। কিন্তু স্বাধীনতার পর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের লক্ষ্য হল কম কাজ করার নানারকম প্রয়াস। এতে শিল্পের ক্ষতি হয়েছে।

দেশবিভাগ যদি বাঙালীর ভাগ্য বিপর্যয়ের ১নং কারণ হয়, তাহলে ২নং কারণ হালফিল লোডশেডিং। এক লোডশেডিংই শিল্পের রথের রশি উল্টোদিকে জোর কদমে টেনে নিয়ে চলেছে।

সুনীল চৌধুরীর বিশ্বাস, দেশবিভাগের ধাক্কা বাঙালীর ক্ষতি তো করেছেই, এখনও সে ধাক্কা সামলে ওঠা যায়নি। দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ নামে একটি বড় বাজার হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার বদলে অন্য কোন বাজার দখল করা সম্ভব হয়নি। পূর্ববঙ্গে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করত, তাদের শিকড় ছিল পূর্ববঙ্গেই। বাঙালীদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে তারাই ছিল বড় তরফ। কিন্তু দেশবিভাগের পর শিকড় উপড়ে এনে তারা পশ্চিমবাংলার মাটিতে আর শিকড় নামাতে পারেনি। চেষ্টা অনেকে করেছে, তা ফলপ্রসূ হয়নি তেমন। অর্থাৎ গুছিয়ে বসা হয়নি।

স্বাধীনতার পর একটা সুযোগ এসেছিল। বাঙালীর পুঁজির অভাব রয়েছে। সেই কারণেই স্বাধীনতার পর ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে যে হাত বদল হয়েছে, তার সূত্র ধরে বাঙালীরা কিছু হস্তগত করতে পারেনি। সেই সুযোগটা পুরোমাত্রায় নিয়েছে অবাঙালীরা। যেমন, স্বাধীনতার পর আমেদাবাদ সূতাকল যে রকম ভাবে ফুলে ফেঁপে উঠল, সূতাকলের উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর বাঙালীরা আর কোন সুযোগই পেল না। এসব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রাজ্য সরকার সে ভূমিকা যথাযথ পালন করতে পারেনি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় খড়গপুরে আই আই টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেরকম উদ্যোগ তো পরে আর কখনও দেখা যায়নি।

ব্যবসায় বা শিল্পে বাঙালীদের একটা স্বাভাবিক অনীহা আছে। সুনীলবাবুর মতে, এই অভিযোগ অংশত সত্য। তা সত্ত্বেও অনেক বাঙালীই এসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। আসলে ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প গড়ে তোলায় যেমন নিজের একটা স্বার্থ থাকে, তেমনি অন্যকে সাহায্য করার মনোবৃত্তিও থাকা দরকার। এই জিনিষটা বাঙালীদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। শ্রমিক বিরোধ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সুনীলবাবু একটা নতুন ব্যাখ্যা দিলেন। বললেন, শ্রমিক বিরোধ শিল্পের ক্ষতি করে। একথা ঠিক। কিন্তু, একই সঙ্গে শিল্প যে গড়ে, তারও ক্ষতি করে। শিল্পপতির ব্যক্তিগত উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। এটা মস্ত বড় ক্ষতি।

এতদসত্ত্বেও, অমিতাভবাবু ও সুনীলবাবু মনে করেন, সুযোগ সুবিধা পেলে বাঙালীরা এখনও অনেক কিছু করতে পারে। তার জন্য সামাজিক দিক থেকে মানসিক দিক থেকে যেমন প্রস্তুতি চাই, তেমনি চাই সরকারের কাছ থেকে যথার্থ ও পর্যাপ্ত সহযোগিতা।

দুই ট্রেড ইউনিয়ন নেতা

দুই ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মার্কসবাদী মনোরঞ্জন রায় ও গান্ধীবাদী ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু—দু'জনেই স্বীকার করেন না যে, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে অবনতির অন্যতম কারণ শ্রমিক অশান্তি। দু'জনেই মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের মনোভাব পক্ষপাতদুষ্ট।

মনোরঞ্জনবাবু বলেন, এই রাজ্যে শ্রমিকরা কথার কথায় ধর্মঘট করে, এ কথা একেবারেই সত্যি নয়। ১৯৭৯ সালে ইনজিনীয়ারিং শিল্পে ধর্মঘট ছাড়াই

দাবিদাওয়ার মীমাংসা হয়েছে। আড়াই লক্ষ চা-শ্রমিককেও ১৯৮০ সালে ধর্মঘট করতে হয়নি। মীমাংসা হয়েছে। ১৯৭৯ সালে সুতাকলে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া মিটে গেল ধর্মঘট ছাড়াই। অথচ চটকলে ধর্মঘট হল। কেন? ধর্মঘট নির্ভর করে মালিকদের মনোভাবের উপর। কথায় কথায় ধর্মঘট নয়, ধর্মঘট হয় ন্যায্য দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে। চটকল মালিকদের অনমনীয় মনোভাবের জন্যই ধর্মঘট হয়েছিল।

এই রাজ্যে শ্রমিক অশান্তির দরুণ উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে—মনোরঞ্জনবাবুর মতে এই অভিযোগও সত্য নয়। আসলে, মালিকরাই উৎপাদন চায় না বিশেষ পরিস্থিতিতে। ১৯৭৫-৭৬ সালে আমেরিকায় মন্দা দেখা দেয়। সব রকম নির্মাণকার্য বন্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় চটের থলির চাহিদা কমে যায়। তখন মালিকরা উৎপাদন কমিয়ে আনে। আবার ধরা যাক মোটরগাড়ির কথা। পেট্রোলের দাম বেড়ে যায়, মোটরগাড়ির চাহিদা কমতে থাকে। হিন্দমোটর কারখানায় সেই কারণেই ১৯৭৫-৭৬ সালে মোটে ৯২৯০টি মোটরগাড়ি তৈরি হয়। অথচ সংকট কেটে যাওয়ার পর ওই শ্রমিকরাই ১৯৭৮-৭৯ সালে তৈরি করল ২০,৫২৫টি মোটরগাড়ি। এ থেকে প্রমাণ হয়, শ্রমিকরা কাজ করতে চায় না? নাকি, শ্রমিকদের ধর্মঘটের দরুণ উৎপাদন হ্রাস পায়?

মৈত্রেয়ী বসুও মনে করেন, শ্রমিক অশান্তির অভিযোগটা আদৌ সত্য নয়। এই ধরণের অশান্তি সব জায়গাতেই আছে। পশ্চিমবঙ্গে এসব কিছু অস্বাভাবিক নয়। অশান্তি যা কিছু তার মূলেও কিন্তু মালিকরা। প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ইউনিয়ন গড়তে দিয়ে, পরস্পরের মধ্যে বিরোধ লাগিয়ে দিয়ে, নানাভাবে ফয়দা তোলার চেষ্টা করা হয়। শ্রমিক অশান্তি বা ঘন ঘন ধর্মঘট এই রাজ্যের শিল্পের ক্ষতি হওয়ার কারণ নয়। শ্রমিক অশান্তির জন্য তো এখন শ্রমদিবস নষ্ট হওয়ার তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের উপরে বোম্বাইয়ের স্থান। তাহলে এই অভিযোগ কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে কেন?

এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবের সমালোচনা করে মনোরঞ্জনবাবু বলেন, স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ বাঙালীদের কোণঠাসা করার যে মনোভাব ইংরেজদের ছিল, স্বাধীনতার পর দিল্লীর কংগ্রেসী সরকারও ওই একই মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর নিজের পছন্দমাফিক কিছু শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বাঙালীদের জন্য বিশেষভাবে ও সামগ্রিকভাবে কোন পরিকল্পনা তিনি নেননি। দেশ ভাগ হওয়ার পর হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ টাকা খরচ করেছেন, তার দশ ভাগের একভাগও খরচ হয়নি বাঙালী উদ্বাস্তুদের জন্য। ওদের জন্য করা হয়েছে ভাল হয়েছে। কিন্তু একই কারণ থাকা সত্বেও বাঙালীদের জন্য নয় কেন? কয়লার দামে সমতার নীতি গৃহীত হল। কিন্তু ওই একই জাতীয় স্বার্থে তুলার দামে সমতার নীতি নয় কেন? গত বিশ বছর ধরে সংসদে এই নিয়ে আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। মনোরঞ্জনবাবু সরাসরি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে শিল্প গড়তে দেয়নি। মানুভাই শাহ যখন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী, তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্পের জন্য যত আবেদন করা হয়েছে, কোন না কোন অছিলায় তা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

মৈত্রেয়ী বসু বলেন, আমাদের দেশে শিল্প গড়েছে ইংরেজরাই। আরোপিত মূলধনের উপর সাম্রাজ্যবাদী শিল্প প্রচেষ্টার ইংরাজ প্রবর্তিত কাঠামোর কোন পরিবর্তন হয়নি স্বাধীনতার পরেও। কেবল স্বাধীনতার পর ইংরাজের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে অবাঙালীরা টাকার জোরে। বাঙালীর অবস্থা আগেও যা ছিল, এখনও তাই আছে। মৈত্রেয়ী দেবী মনে করেন, জাতিগত বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলা সহজ নয়। শিল্পের প্রতি প্রবণতা না থাকাটাই বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য। উনি অবশ্য মনে করেন, স্বাধীনতার পর কেন্দ্রের মনোভাব পশ্চিমবঙ্গের প্রতি নিশ্চিতভাবেই বৈষম্যমূলক। একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি এটা বোঝাবার চেষ্টা করেন।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার আগে ভারতের রপ্তানি পণ্যের ৫২ শতাংশ যেত কলকাতা বন্দর দিয়ে। স্বাধীনতার পর এই অবস্থাটা বদলাতে থাকে। এখন

তো অবস্থা খুবই খারাপ। অজুহাত হিসাবে দেখানো হল, গঙ্গার নাব্যতা নেই, আর শ্রমিক অশান্তি। এগুলো একটাও আসল কারণ নয়। আসল কারণ হল, পূর্ব উপকূলের বাণিজ্য পশ্চিম উপকূলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। তৈরি হল করাচির বিকল্প গুজরাটের সমুদ্রসৈকতে কাণ্ডালা বন্দর। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই কাণ্ডালা হয়ে উঠল বোম্বাই বন্দরের প্রতিদ্বন্দ্বী। বোম্বাইয়ের বাণিজ্যে ঘাটতি পড়তে লাগল। অমনি ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার উঠল। তখন ঠিক হল, কলকাতা বন্দরের বাণিজ্য নিয়ে আসা হোক কাণ্ডালায়। তাই, আসামের চা নিকটবর্তী কলকাতা বন্দরে না এনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সুদূর কাণ্ডালায়। আর এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রেলের মাশুলে চা রপ্তানিকারকদের ভর্তুকি দিতে লাগলেন। এর পরেও কি আর কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে ?

দুই মন্ত্রী

দুই মন্ত্রীই প্রায় একই সুরে কথা বলেছেন। দু'জনেই মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে অনগ্রসরতার জন্য মুখ্যত দায়ী কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক নীতি ও আচরণ। এই দুই মন্ত্রী হলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ডাঃ কানাই-লাল ভট্টাচার্য্য এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের চিত্তব্রত মজুমদার।

কানাইবাবু মনে করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলেই কেবল পশ্চিমবঙ্গে নয়, গোটা পূর্বাঞ্চলেই শিল্পে ও শিল্প-অর্থনীতিতে আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে।- এর ফল মারাত্মক। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের প্রসার ঘটল না। অথচ, অন্য রাজ্যে বিশেষ করে আরব সাগরের তীরে শিল্পের ব্যাপক

প্রসার ঘটানো হল। কেন্দ্র সচেতনভাবেই এটা করেছেন। আসামের ডিগবয়ে তেল পাওয়া গেল। সেই তেল শোধনের জন্য কাছের পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিয়ে বিহারের বারৌনি বাছাই করা হল। এই বাংলা ছিল কেমিকেল শিল্পে পথিকৃৎ। কিন্তু দেশ বিভাগের পর যাবতীয় ওষুধ ও কেমিকেল কারখানা বসানো হল আরব সাগরের তীরে। ইলেকট্রনিক শিল্পের সূত্রপাত কলকাতায়। কিন্তু এই শিল্পের প্রসার ঘটানো হল কেরল ও মহারাষ্ট্রে। কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় প্রচেষ্টায় এ সব হয়েছে।

বড় শিল্পে এখন বাঙ্গালী নেই। স্বাধীনতার পর বড় বড় শিল্প টাকার জোরে অবাঙ্গালীরা কিনে নেয় ইংরাজদের কাছ থেকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বড় শিল্পের প্রসার ঘটেনি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পর তো একেবারেই হয়নি। দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ আজও হয়নি। একই কথা হলদিয়ার সার প্রকল্প সম্পর্কে। কেন এসব হচ্ছে না? মাঝারি ও ছোট শিল্প নির্ভর করে বস্ত্র শিল্পের সম্প্রসারণের উপর। এ রাজ্যে বহুদিন বড় শিল্পের সম্প্রসারণ হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই মাঝারি ও ছোট শিল্পের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে।

এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাঙ্গালীরা শিল্প গড়তে পারে না, কিন্তু অবাঙ্গালীরা পারে কি করে? এর উত্তরে কানাইবাবু বলেন, বাঙ্গালীদের পুঁজি নেই। অবাঙ্গালীদের আছে। এটাই মুখ্য কারণ। যে সব শিল্প একদা বাঙ্গালীর গৌরব বলে চিহ্নিত ছিল, সেগুলির এই দুর্দশা কেন? উত্তরে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বেহিসাবিভাবে টাকা শিল্প থেকে বের করে নেওয়া হয়েছে। পুনর্বিনিয়োগে উৎসাহ দেখায়নি। অন্য কারণ হল অন্তর্কলহ।

চিত্তব্রতবাবু অবশ্য গোড়ায় বাঙ্গালী কথাটায় আপত্তি তোলেন। তিনি বলেন, বাঙ্গালী পিছিয়ে পড়ছে—এভাবে বলা ঠিক নয়। তবে, এই বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প গড়ে তোলায় কিছু অসুবিধা আছে। আর চিত্তবাবুর

মতেও, প্রধান অসুবিধা কেন্দ্রের নীতি। ছোট ও মাঝারি শিল্প গড়ায় উদ্যোগীদের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়ার সময় কোন সিকিউরিটি চাইবে না। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত নীতি। কিন্তু বাস্তবে ব্যাঙ্কগুলি সিকিউরিটি ছাড়া এক পয়সাও ঋণ দেয় না। নিজের টাকা না থাকলে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাওয়া যায় না। স্বাভাবিকভাবেই, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরা ব্যাঙ্কের সাহায্য তেমন পাচ্ছে না। টাকা আছে বলেই অবাঙ্গালীরা সহজেই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পাচ্ছে।

এর পরের অসুবিধা হল কাঁচা মাল পাওয়ার ব্যাপারে। কাঁচা মাল বেশির ভাগই আনতে হয় অন্য রাজ্য থেকে। আনার খরচ বেশি পড়ে। কয়লা ও লোহার ক্ষেত্রে শুল্ক ভর্তুকির দরুণ অন্য রাজ্য যে সুবিধা পায়, অনুরূপভাবে এই রাজ্য তুলা বা অন্য কোন কাঁচা মালে কোন শুল্ক ভর্তুকি পায় না। তাছাড়া কোন কোন কাঁচা মাল সরকার নিজেই বণ্টন করেন। এ ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশের বেশি কাঁচা মাল পাওয়া যায় না। বাকিটা বেশি দামে খোলা বাজার থেকে কিনতে হয়। কিনতেই হয়। তা কিনতে গিয়ে টাকায় টান পড়ে। অবস্থা পরে এমনই হয় যে, সেই শিল্পটা রুগ্ন হয়ে পড়ে। খোলা বাজারে কাঁচা মাল কেনার জন্য ব্যাঙ্কও টাকা দেয় না।

তৃতীয় অসুবিধা হল, প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া। যতই দিন যাচ্ছে, চাহিদা বাড়ছে। রুচিও বদলাচ্ছে। এই দুইয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গেলে শিল্পকে আরও বেশি যন্ত্র-নির্ভর হতে হবে দ্রুত ও ব্যাপক উৎপাদনের জন্য। কিন্তু এটা করতে গেলে বেকারি বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। কাজেই এখনও ছোট ও ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পগুলিকে চিরাচরিত পদ্ধতি মেনে চলতে হচ্ছে। তাতে দাম বেশি পড়ে। উৎপাদনও কম হয়। স্বভাবতই অন্য রাজ্যের সঙ্গে এ সব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় এই রাজ্য পেরে উঠছে না।

সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ

ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প গড়ার কাজটাকে বাঙ্গালীরা কখনই সম্মানজনক বলে মনে করেনি। সেই ট্র্যাডিশন এখনও চলছে। বলেছেন সমাজসেবী পান্নালাল দাশগুপ্ত। প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। তাঁর মতে, বাঙ্গালীর মেধা আছে। সেই মেধা ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্পে লাগালে তাতেও সাফল্য অনিবার্য ছিল। কিন্তু শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে সন্তুষ্ট বাঙ্গালী ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প করতেই হবে, এমন স্থির সিদ্ধান্ত কখনও নেয়নি। এটা বাঙ্গালীর দোষের কথা নয়। এটা তার জাতিগত বৈশিষ্ট্য।

পান্নালালবাবু বলেন, এখনও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর চোখে ব্যবসাদারের সামাজিক প্রতিষ্ঠা তেমন নেই। এই মনোভাব বাঙ্গালীর পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। স্বাধীতার পর অর্থনীতির কাঠামো এমনভাবে দ্রুত বদলে গিয়েছে যে, স্বাচ্ছন্দ্য সামগ্রী কেনার ক্ষমতা আছে মাত্র ১০ ভাগ লোকের। এদের চাহিদার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গিয়েছে। ফলে, ওই চাহিদার সঙ্গে সমতা রেখে পণ্য উৎপাদন করতে হলে বড় রকমের সংস্থার দ্বারাই তা সম্ভব। অন্য রাজ্যের শিল্পপতিরা টাকার জোরে এটা করতে পেরেছে। বাঙ্গালী পারেনি। অন্যদিকে পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলি লোকসান দিতে দিতে উঠে যেতে বসেছে।

তা সত্ত্বেও, বাঙ্গালী শিল্প ও ব্যবসায় এতটা মার খেত না, যদি স্বাধীনতার পর নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শুরু করা যেত। তা হয় নি। বরং উল্টোটাই হয়েছে। আর এর জন্য দায়ী সরকারী মহলের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি। প্রতি পদে পদে ঘুষ দিতে হয়। ঘুষের কারবারে আসল কারবার তলিয়ে

যায়। এছাড়া, বাঙ্গালীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতারও অভাব বড় বেশি। অবাঙ্গালীদের মধ্যে কিন্তু এটা একটা নিয়মের মত চলে আসছে। ওরা পরস্পরকে যথাসম্ভব সাহায্য করে।

পান্নালালবাবু বলেন, ব্যবসা বা শিল্পে এত সব বাধা। সেইজন্যই অনেকে চাকরি করাটাকে নিরাপদ মনে করে। চাকরি করার আরও একটা কারণ আছে। চাকরি করলে পরিশ্রম করতে হয় না। সরকারী অফিসগুলি তার প্রমাণ। বাঙ্গালীর ভাবখানা হল, কেউ একটা কিছু করে দেবে। আমরা সেখানে চাকরি করব। অন্যদিকে এর ঠিক বিপরীত মনোভাব থাকায় পাঞ্জাব, হরিয়ানা এগিয়ে গেল। চারিত্রিক উন্নতি আগে দরকার। পান্নালালবাবুর মতে রাজনৈতিক দলগুলি সরকার গড়ে। সরকারের মনোভাব গড়ে ওঠে, রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এই দলগুলির নীতি কি? দৃষ্টিভঙ্গী কি? আজও তো ঠিক হল না, কে ভারতীয়, কে দেশপ্রেমিক? অবস্থা এখন এমন জায়গায় এসে ঠেকেছে যে, কেবল ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প নয়, কোন ব্যাপারেই বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ নেই। বাঙ্গালী মানেই প্রবাসী বাঙ্গালী।

বাঙ্গালীর নিন্দা করার দলে নন রবীন্দ্রবাবু। বাঙ্গালীর এই পিছিয়ে পড়ার কারণ বলতে গিয়ে রবীন্দ্রবাবু একটা নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, বাঙ্গালীর মগজ আছে। ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পে সেই মগজ ব্যবহার করলে, বাঙ্গালীও বণিক হতে পারত। শিল্পপতি হতে পারত। ইংরেজ আমলেই শিক্ষা দীক্ষায় আগুয়ান বাঙ্গালীর ভাত কাপড়ের বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়ায় সে শিল্পের কারবার করল, কিন্তু সে শিল্প চটশিল্প নয়, বস্ত্রশিল্প নয়, সে হল সাহিত্যশিল্প, চিত্রশিল্প। বাঙ্গালী ভেবেছিল, এইভাবেই জীবন কেটে যাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রথম ছন্দপতন ঘটল। তখনই দেখা গেল, অস্তিত্বের সংকট। তখনই, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প গড়ার জন্য একটা স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। সেটা হয়নি। হয়নি রাজনীতিকদের জন্য।

রবীন্দ্রবাবু বলেন, স্বাধীনতার পর একটা নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হল—পলিটিশিয়ান। এ'দের কাছে দেশসেবা গৌণ, মুখ্য আত্মসেবা। এ'রা প্রায় সকলেই নীতিভ্রষ্ট। এ'রা পথ দেখাতে পারেননি। এ'রা কিছু গড়ে তুলতে চেষ্টা করেননি। এরাও সরকারী কর্মচারীর মতই বিনা পরিশ্রমে মহান নেতা হয়ে যাচ্ছেন। আর, অগণিত মানুষ আমরা এই পলিটিশিয়ানদের ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া হয়ে পড়ছি। এই পরিস্থিতিতে আমাদের ছেলেদের কোন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীই গড়ে উঠল না। তাহলে শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যই বা গড়ে উঠবে কেন? আমাদের ছেলেদের প্রতিদিন সকালে উঠে প্রতিজ্ঞা করা উচিত: কোন পলিটিশিয়ানের সঙ্গে কথা বলব না।

বাজোরিয়া, সিংহানিয়া

ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে বাঙালীর পশ্চাদপসারণের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই রাজ্যের অবাঙালী ব্যবসায়ী সত্যনারায়ণ বাজোরিয়া সরকারের সুসম শিল্প-নীতির অভাবকেই দায়ী করেছেন। আর এক অবাঙালী ব্যবসায়ী মদনমোহন সিংহানিয়া মনে করেন, দায়ী—এক শ্রেণীর (১) সাহিত্যিক, (২) সাংবাদিক, (৩) রাজনীতিক।

এই দুই ব্যবসায়ী জাতি বিচারে অবাঙালী হলেও জীবনচর্যায় এ'রা শতকরা একশ' ভাগ বাঙালী। তিন পুরুষ ধরে আছেন বাংলায়। বাঙালীদের চেনেন জানেন অন্য যে কোন অবাঙালী ব্যবসায়ীর চেয়ে বেশি। বাঙালী কেন ব্যবসা করতে পারে না, কেন শিল্প গড়তে পারে না, কেন ব্যবসা-শিল্প পুরুষানুক্রমে

চালাতে পারে না, সে কথা ওঁরা বলেছেন দুঃখের সঙ্গে, স্নেহের সঙ্গে। বাঙালীর প্রতি মমত্ব বোধ থেকেই তাঁদের এই সমালোচনা।

সিংহানিয়াজী বলেন, বাংলা সাহিত্যের এক শ্রেণীর লেখক তাঁদের লেখায় ব্যবসায়ী মাত্রেই চোর, ভেজালের কারবারী এসব কথা ফলাও করে বলে থাকেন। এক শ্রেণীর সাংবাদিকও এমনভাবে সংবাদ পরিবেশন করেন যেন ব্যবসায়ীরা চোর ডাকাতের সমগোত্রীয়। আর, এক শ্রেণীর রাজনীতিকরাও তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবসায়ীদের অসাধু প্রতিপন্ন করতে উৎসুক। এঁদের লেখায় ও কথায় বাঙালীদেরও ধারণা হয় ব্যবসা মানেই অসততা। বাঙালীরা তাই ব্যবসা করতে গিয়ে বদনাম কিনতে আগ্রহী হয় না। অথচ, ব্যবসা বা শিল্পের মূল ভিত্তিই হল সততা। কেউ কেউ অসৎ কাজ করে বলে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি মাত্রেই অসৎ, এমন মনে করা উচিত নয়। অবাঙালীরা ব্যবসা করাটাকে অসৎ কাজ বলে মনে করে না।

বাঙালীর ব্যবসা করার বাধা আসে পরিবার থেকেই। মা, বাবা পরিবারের কেউই একটি বাঙালী ছেলেকে ব্যবসা করতে উৎসাহ দেয় না। উপরন্তু বন্ধু বান্ধব আত্মীয়পরিজন উপহাস করে থাকে। অন্যদিকে বাঙালী ছেলেরা জীবনের শুরুতেই ভিক্ষা করতে শেখে। প্রথমে চাঁদার খাতা নিয়ে ভিক্ষা মাগে দুয়ারে দুয়ারে। পরে মাসকাবারে হাত পাতে বেতন নিতে। এইভাবে গড়ে ওঠা কোন জাতের পক্ষে ব্যবসা করা সম্ভব নয়। ব্যবসা করতে গেলে হাত পাততে নেই, হাত উপুড় করতে শিখতে হয়।

বাঙালীদের একটা সবজান্তা ভাব আছে। সে সব জানে। সব বোঝে। নিজের শেখবার জানবার কিছু নেই। সে অপরকে জানাবে। বোঝাবে। ভুয়া আত্মসম্মান জ্ঞান বাঙালীর ক্ষতি করেছে। বাঙালী পরিশ্রম করতে চায় না— এটা ভুল কথা। বাঙালীর পুঁজি নেই—একথাও ভুল। আসলে, বাঙালী প্রথম থেকেই বাবু। আর বড় বেশি আইনবাজ। সেইজন্য সে পদে পদে

বাধার সৃষ্টি করতে ওস্তাদ। এসব "গুণ" থাকলে ব্যবসা করা যায় না। বাঙালী বাক্‌সর্বস্ব। মাড়োয়ারি ব্যবসা ছাড়া অন্য কোন কথাই বলবে না। কিন্তু বাঙালী মালিক, কর্মচারী অফিসে বসেও রাজনীতি, মাঠ-ময়দান নিয়ে কথা বলে। আমরা বলি, তুমি খদ্দেরকে মাল দাও। শিক্ষা দেবে কেন? এ সবই ব্যবসার আচরণের বৈশিষ্ট্য। এসব জানতে হয়। মানতেও হয়।

বাজোরিয়াজী বলেন, ব্যবসা করতে গেলে খাটতে হয়, ঝুঁকি নিতে হয়। বাঙালী খাটতে পারে, কিন্তু ঝুঁকি নেবার মত সাহস নেই। সততার প্রশ্নে বাঙালী অবাঙালীর মধ্যে কোন ভেদ নেই। কিন্তু বাঙালীর মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে, ব্যবসা করা মানেই চুরি জোচ্চুরি করা। এটা মনের মধ্যে এমন গেঁথে আছে যে, বাঙালী মনে করে তার দ্বারা ব্যবসা হবে না। কারণ তার দ্বারা চুরি করা সম্ভব নয়। ব্যবসা করা মানে চুরি করা—এই ধারণাটাই মিথ্যা।

বাঙালীরা বড় বেশি রাজনীতি করে বলে এই রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্পে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়নি—এটা ঠিক নয়। রাজনীতি করলে ব্যবসা করা যাবে না, এমন কোন নিয়ম নেই। রাজনীতি করাটাও জীবনচর্যার অঙ্গীভূত। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এক সময় এই রাজ্যে শিল্পের প্রসারে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এখন সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আসলে, শিল্পে বা ব্যবসায় একটা ন্যায়সঙ্গত দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক অটুট রাখতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাজোরিয়াজীর মূল অভিযোগটা কিন্তু সরকারের প্রতি। স্বাধীনতার পর অন্যান্য রাজ্যে রাজ্যসরকারগুলি ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনে যে তৎপরতা দেখিয়েছেন, এ রাজ্যে তেমন হয়নি। এ রাজ্যে যতটুকু হয়েছে তার মধ্যেও কোন সুসম উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। স্বাধীনতার পরে স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। কলকাতা আগে থেকেই অবাঙালীদের হাতে ছিল। কাজেই এখানে বাঙালীরা খুব সুবিধা করতে পারেনি। এছাড়া তো

আর একটাই শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে—দুর্গাপুরে। যেখানে অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে, সেই দুর্গাপুর আসানসোলেও কিন্তু অবাঙালীরা আগে থেকেই কিছু ছিল। কাজেই বাঙালীরা সেখানেও একশ'ভাগ ফাঁকা জমি পায়নি। আসলে প্রতিটি জেলায় যদি একটি করে শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হত এবং জেলায় জেলায় এইসব শিল্পাঞ্চলের মধ্যে সমতা রাখার চেষ্টা হত, তাহলে লোকাল ম্যান হিসাবে বাঙালীরা অনেক বেশি সংখ্যায় শিল্পে ও বাণিজ্যে আসতে পারত। এইভাবে চিন্তা করে শিল্পনীতি কখনও গ্রহণ করা হয়নি। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ? আসলে এটা একটা রাজনৈতিক চাল, নিজেদের দোষ এড়ানোর জন্য।

সাহিত্যিক, সাংবাদিক

বাঙালী চায় রাতারাতি বড়লোক হতে বা কমিউনিষ্ট হতে। বস্তুত, রাতারাতি এর কোনটাই হওয়া যায় না। এই মানসিকতা নিয়ে ব্যবসা বা শিল্পও গড়ে তোলা যায় না। এই অভিমত প্রবীণ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের। আর, প্রবীণ সাংবাদিক কালীপদ বিশ্বাসের ধারণা, ব্যবসা বা শিল্প গড়ার মত ট্রেনিং বাঙালীর নেই। আজ হচ্ছে না।

অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে বাঙালীর অক্ষমতা নিয়ে হাহুতাশ নতুন নয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আমল থেকেই চলে এসেছে। তিনি এ নিয়ে অনেক লিখেছেনও। একটি বইয়ের নাম ছিল: বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার। বেশ মনে আছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ক্ষুব্ধ কণ্ঠে লিখেছিলেন: 'বাঙালী খড়ের আগুনের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া দপ করিয়া নিভিয়া যায়।' কাজেই এ কোন নতুন সমস্যা নয়।

বাঙালী পরিশ্রম করতে পারে না এ অভিযোগ ঠিক নয়। তবে পার্টনারশিপ বিজনেসে একজন আর একজনকে সহ্য করতে পারে না। মিলেমিশে থাকাটা বাঙালীর ধাতে নেই। বাঙালীরা ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প একেবারে করে নি, তা নয়। কিন্তু তাও টি ঁকিয়ে রাখতে পারেনি। পারস্পরিক বিবাদে সব ধ্বংস হয়েছে। আগে যে যৌথ পরিবারের আদর্শ আমাদের ছিল, তা ব্যবসা করার অনুকূল ছিল। তখন বসাক, শেঠ, সাহা, শীলরা ব্যবসা বাণিজ্য করেছে। এখন বাঙালীর মধ্যে সেই আদর্শ একেবারেই নেই। মাড়োয়ারিদের মধ্যে কিন্তু এখনও যৌথ পরিবারের নীতি ও কানুন চালু আছে। পরস্পরকে সাহায্য করার প্রবৃত্তি বাঙালীর নেই। অবাঙালীদের মধ্যে একটু বেশি মাত্রায় আছে। সব শিল্প বাংলা থেকে বোম্বাই বা আমেদাবাদ চলে যাচ্ছে বলে দুঃখ করে লাভ নেই। স্বাধীনতার পর এসব ঘটেছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদের শিল্পপতিরা কংগ্রেসের তহবিলে মোটা টাকার চাঁদা দেয়। যে চাঁদা দেয়, তার কথা একটু শুনতে হয়। তাই আরব দরিয়ায় ভারতের শিল্প-রাজধানী গড়ে উঠল। স্বাভাবিক নিয়মেই কলকাতার বহু শিল্প বঙ্গোপসাগর ছেড়ে ঠাঁই নিল আরব সাগরে।

কালীপদ বিশ্বাস বলেন, পুঁজি, কাঁচা মাল ও বাজার—এই তিন নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প। এর একটিও জানা না থাকলে কিছুই হবে না। বাঙালীর এই জানাটাই হয়ে ওঠেনি। ব্যবসা বা শিল্প গড়ার যে টেনিং—মাড়োয়ারি বা সিন্ধী বা গুজরাটিদের তা আছে। বহুকাল ধরেই ওরা এই ট্রেনিং পেয়ে এসেছে। বাঙালীদের ট্রেনিং নেই। এ ব্যাপারে কোন ঐতিহ্য বাঙালীর গড়ে ওঠে নি। ফলে, ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত হাজার রকমে চেষ্টা চালিয়েও বাঙালীকে দিয়ে ব্যবসা বা শিল্প হয়নি। ইংরাজদের সংস্পর্শে এসে ভারতবাসীরা নতুন নতুন চেতনায় সমৃদ্ধ হতে লাগল। সেই সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্র ধরে বাঙালী জমি কিনে নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা করে নিল। কিন্তু গুজরাটিরা, মাড়োয়ারিরা বা সিন্ধীরা ইংরাজের পেছনে পেছনে ছুটে গেল দূর দূরান্তে ব্যবসা বাণিজ্যের পসরা নিয়ে। পরে, ব্যবসা থেকে

তারাই হয়ে উঠল শিল্পপতি। বাঙালীর ক্ষেত্রে এ রকম ঘটনা ঘটে নি। কালক্রমে বাংলায় জমিদারির অবস্থাও সঙ্গীণ হয়ে এল। লক্ষ্য করবার বিষয়, বাংলায় বাঙালী জমিদাররাই আর্থিক দুর্গতির মধ্যে পড়ল। অথচ অবাঙালী জমিদারদের কিন্তু সে অবস্থা হয় নি। অর্থাৎ জমিদারি চালাতে গেলেও যে সামান্য ব্যবসাবুদ্ধি লাগে, বাঙালীর তাও ছিল না। এখনও এসব অর্জন করা হয়নি।

স্বাধীনতার পর, বাঙালীকে নানাভাবে ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় করেছিলেন। কিন্তু কোথাও বাঙালীরা টি'কতে পারেনি। অবাঙালীরা সংগঠিত শক্তি। বাঙালীরা এদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। কালীপদবাবু বলেন, এটা হওয়া উচিত নয়। অবাঙালীরা যদি এই ভাবে বাধার সৃষ্টি করে নিজেদের রাজ্যপাট অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করতেই থাকে, তাহলে সেটা হবে মারাত্মক ভুল। একটা পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা দরকার, যাতে বাঙালী অবাঙালী উভয়েরই সুবিধা হয়। না হলে, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে একদিন না একদিন বাঙালীকে মরীয়া হয়ে উঠতে হবে। তখন অবাঙালীর পক্ষেও সেটা বিপদের কারণ হতে পারে। বাঙালীর যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব আছে, অদূর ভবিষ্যতে তা নাও থাকতে পারে।

অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র মন্ত্রী হয়েছেন তিন বছর। তাঁর সাবেক পরিচয় একজন অর্থনীতিবিদ হিসাবে। অতুল্য ঘোষ এখন বিধান শিশু উদ্যানের কারিগর। একজন লেখকও। কিন্তু আসলে তিনি একজন রাজনীতিবিদ। স্বাধীনোত্তর কালের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে অতুল্যবাবুর ছিল

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অর্থনীতিবিদ অশোকবাবু দেখিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির দরুণ পূর্বাঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতুল্যবাবু অপরকে দোষ দেওয়ার আগে নিজের দোষত্রুটি সংশোধনের আর্জি পেশ করেছেন।

অশোকবাবু অবশ্য ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পে বাঙালী পিছু হটছে কেন, এর উত্তরে বাঙালী কথাটায় আপত্তি জানান। তিনি বলেন, কেবল বাঙালী নয়, বাংলারও নয়, এটা আসলে গোটা পূর্ব ভারতেরই সমস্যা। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকার এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিলেন যার ফলে এই অঞ্চলের শিল্পের সমৃদ্ধি হল না। কাঁচামাল সরবরাহের আড়ত হয়ে রইল। প্রাকস্বাধীনতা আমলের অবস্থার মতই। পার্থক্য শুধু এই, ইংরাজ আমলে এখানকার কাঁচামাল রফতানি হত বিলাতে। এখন রফতানি হয় পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, তামিলনাড়ুতে। ব্যাপারটা কিন্তু একই রয়ে গেল।

স্বাধীনতার পর, অশোকবাবু বললেন, সারা দেশে সুসম শিল্প বিকাশের কথা উঠল। প্রাকৃতিক সম্পদ হাতের কাছে থাকায় অন্যান্য রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে এগিয়ে ছিল। সুসম শিল্পের বিকাশের জন্য ঠিক হল, কয়লা, লোহা ও ইস্পাত সব জায়গায় একই দামে পাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার পরিবহনে ভরতুকি দিয়ে দামে সমতা বজায় রাখবেন। এতে অন্য সব রাজ্যের সুবিধা হল। কিন্তু আমরা যে অতিরিক্ত সুবিধা হারালাম, তার বিনিময়ে আমাদের কিছু দেওয়া হল না। আমাদের প্রয়োজন ছিল গুজরাটের তুলো আর মহারাষ্ট্রের কেমিক্যালস। এই দু'টি আনতে আমাদের পরিবহন শুল্কে কোন ভর্তুকি দেওয়া হয় না। একদিকে প্রাকৃতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলাম, অন্যদিকে প্রয়োজনীয় ওই দু'টি কাঁচামাল আনতে খরচ পড়ে বেশি।

এরপর কেন্দ্রীয় সরকার আর একটি সিদ্ধান্ত নিলেন। কেন্দ্রীয় অর্থবিনিয়োগ সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হল: পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নত রাজ্য। ওখানে

কম নজর দিয়ে অন্যান্য রাজ্যে বেশি করে অর্থ বিনিয়োগের দিকে নজর দিন। তাই করা হল। কেন্দ্রীয় অর্থ বিনিয়োগ সংস্থাগুলির ৯০ শতাংশ টাকা এযাবৎ পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে খরচ করা হয়েছে।

১৯৬৫ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। তখন ভারতেও ব্যয় সঙ্কোচের প্রশ্ন ওঠে। এর প্রথম কোপটাই এসে পড়ে রেল দপ্তরের উপর। পশ্চিমবাংলার রেলের রোলিং ষ্টক উৎপাদন সাংঘাতিক ভাবে কমিয়ে দেওয়া হল। এর ফলে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মার খেল।

এর পর আসে কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব উদ্যোগ। অশোকবাবু বললেন, গত ১৫ বছরে এক মেট্রো রেল ছাড়া কেন্দ্র এই রাজ্যে আর একটা পয়সাও অন্য কোন খাতে ব্যয় করেননি। কেন্দ্রীয় সরকার কোন শিল্প আগ বাড়িয়ে করতে তো আসেইনি, বরং যেগুলি হওয়ার কথা, সেগুলি শেষ পর্যন্ত হয় অন্য রাজ্যে। জাহাজ নির্মাণ কারখানা, বেসিক ড্রাগ তৈরির কারখানা, সার কারখানা, ইলেক্ট্রোনিক কারখানা, ট্রাক তৈরির কারখানার—এই সবই এখানে হওয়ার কথা ছিল। হয়নি। কয়েকটি আজ হচ্ছে কাল হচ্ছে করে এখনও হয়নি।

এবার রাজ্য সরকারের নিজস্ব উদ্যোগের কথা বলা যাক। নিজের রাজ্যে শিল্প গড়তেও কেন্দ্রের অনুমতি লাগে। টাকাও লাগে। দু'টোই চেয়েছি, এখনও পর্যন্ত সারা মেলেনি। কিছু রুগ্ন শিল্পকে বাঁচানোর জন্য অধিগ্রহণের প্রস্তাব করেছি। তার কিছু হয়েছে, কিন্তু অনেক হয়নি। এই নিয়ে কেন্দ্রের টালবাহানা বিস্ময়কর, রহস্যময়।

প্রশ্ন করেছিলাম, এতো গেল কেন্দ্রের বা রাজ্য সরকারের ভূমিকার কথা। কিন্তু আমরা বাঙালীরা ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারি না কেন? যা করেছিলাম, তাই বা রাখতে পারছি না কেন? আমাদের নিজস্ব কোন ত্রুটি নেই কি? উত্তরে অশোকবাবু বললেন: ঝটিতি দু'টো কারণ মনে পড়ছে। এক, বাঙালীরা একটি

শিল্প গড়ে তুলল। উত্তরসূরীদের আমলে সেই শিল্পে দেখা দিল শরিকানা। বাঙালীরা এই শরিকী ব্যাপারটা সইতে পারে না। পারস্পরিক বিরোধে, হয়ত অতি তুচ্ছ কারণে, শেষ পর্যন্ত শিল্পের সমাধি রচনা করে। দুই, বাইরের টাকা খাটানোয় বাঙালীর প্রতিভা, সাহস ও প্রবৃত্তি নেই। যতটুকু আছে, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায়। ব্যাংকের কাছ থেকে, সরকারের কাছ থেকে বা অর্থ লগ্নী কোন সংস্থা থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকা খাটিয়ে ব্যবসা বা শিল্পের প্রসার ঘটানোর মত শক্ত মানসিকতা বাঙালীর মধ্যে খুব কমই দেখা যায়।

অতুল্যবাবু লিখেছেন: কিছুদিন আগে কলকাতার একটি দৈনিক সংবাদপত্রে[১] 'বাঙালী কোথায়' এই শিরোনামায় দৃষ্টিআকর্ষণকারী একটি বিষয় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ব্যবসায় ও কর্মে বাঙালী যে হঠে যাচ্ছে, তা প্রকাশ করা। বিষয়টি খুব প্রয়োজনীয়—এ নিয়ে কোন মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। কিন্তু কেবলমাত্র এইভাবে লিখলেই কি সমস্যার সমাধান হবে?

ইংরাজ আসার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বিশেষ করে মাদ্রাজের অনেক লোক সৈন্যদলে ভরতি হয়েছিল—নাম হয়েছিল 'তেলেঙ্গী সেনা'। আর মধ্যবিত্ত বাঙালী, বিশেষ করে ফারসী জানা কিছু লোক' ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কমিসারিয়েট এবং অন্যান্য বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বদান্যতায় অনেক বাঙালী ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অবশ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছাড়াও অন্যান্য বিদেশী শক্তিরও অনেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। একটি প্রবচন আছে, 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'। এই গৌরী সেনের বাড়ী ছিল হুগলী জিলার সপ্তগ্রামে। সপ্তগ্রাম তখন বর্ধিষ্ণু বন্দর—দেশবিদেশের জাহাজ যাতায়াত করত। গৌরী সেন পর্তুগীজ বণিকদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে ওঠেন। তাদের মাল উনি বিভিন্ন জায়গায় চালান দিতেন। কথিত আছে, তিনি পাঁচ নৌকা রাং কিনেছিলেন পর্তুগীজদের কাছ থেকে। পরে দেখা যায়, সেগুলো রাং নয় রূপো। তাইতেই ওঁর ঘরে লক্ষ্মী উথলে ওঠে। এইভাবে বহু বাঙালী পরিবার ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ ও সঙ্গতিপন্ন হয়ে ওঠে। পঞ্চাশ বছর আগেও যেসব বাঙালী

পরিবার ধনী বলে খ্যাত ছিলেন, একটু অনুশীলন করলেই দেখা যাবে যে, তাঁদের সকলেরই ধন সংগৃহীত হয়েছিল হয় কোম্পানীর বদান্যতায় অথবা ইংরাজ সওদাগরের সহায়তায়। নানারকম চালানী কারবার ও ব্যবসা করে এঁরা সমৃদ্ধ ও সঙ্গতিপন্ন হন। এবং তারপরই ব্যবসার উপর থেকে মন চলে যায় এবং জমিদারি ক্রয় করতে থাকেন। একটা উদাহরণ দিলেই হবে। বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ দানবীর শ্রদ্ধেয় মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর এক চুক্তিপত্রে দেখা যাবে যে, এক কোটি টাকার বিনিময়ে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় সব কয়লাখনির স্বত্ব বেঙ্গল কোল কোম্পানীকে অর্পণ করেন। সেই এক কোটি টাকা দিয়ে জমিদারি ক্রয় করা হয়। কলকাতায় আরও অনেকে ব্যবসা করে বিরাট ধনী হন এবং তাঁদের অনেকের নামে রাস্তা আছে। মধ্য কলকাতায় একটা বিশেষ রঙের বাড়ি দেখলেই লোকে 'লাহাবাড়ি' বলে। এই লাহাবাড়ির প্রাণপুরুষ ছিলেন মহারাজা প্রাণকৃষ্ণ লাহা। তিনি যে ব্যবসা রেখে গিয়েছিলেন সে ব্যবসার বেশির ভাগই এখন লাহা পরিবারের মধ্যে নেই।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর কোম্পানীর দেওয়া বহু সুযোগ-সুবিধার ফলে অর্থশালী হয়েছিলেন। তার অধিকাংশই যায় জমিদারি কেনায়। রবীন্দ্রনাথের দাদাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যবসা করতে গেলেও সে প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। শেঠ বাবুদের পুরোনো ইতিহাসও তাই। এমন অবস্থা হয়েছিল যে, বাঙালী বাবুরা তখনকার দিনে নগদ লাখ টাকা জমা দিয়েও ইংরাজ ব্যবসায়ীর ঘরে চাকুরি করতেন। তাতেই খুশী। একসময়ে যে চেষ্টা ও উদ্যম বাঙালী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ধন-প্রবাহ এনে দিয়েছিল, ধীরে ধীরে সেই সমাজের মধ্যে থেকে পরিশ্রম করবার প্রবৃত্তি লোপ পায় এবং স্থিতিশীলতার দিকে নজর বেশী যায়। যে কৃচ্ছ্র সাধন ও পরিশ্রমের ফলে পূর্বপুরুষরা কৃতী হয়েছিলেন, তা না করে চেষ্টা হতে থাকে পরিশ্রম বিমুখ হয়ে কিভাবে বাবু নাম কেনা যায়। রামদুলাল সরকারের বংশধর ছাতুবাবু, লাটুবাবু এ ব্যাপারে খুবই প্রসিদ্ধ।

যাকে বাঙালীর স্বর্ণযুগ বলা যায়, সেই যুগে বাঈজীর নাচ আর পাখির লড়াইএর পিছনে বাঙালী বাবুরা যে অর্থ ব্যয় করতেন, তার গল্প শোনার মত। শোভাবাজারের রাজবংশের দিকে দেখলেও এই জিনিসই উদঘাটিত হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকেই এই অবস্থা হতে শুরু হয়। এবং ধীরে ধীরে শ্রমশীলতা যে অপ্রয়োজনীয়—এই বোধ সমাজের উর্ধতন মহলের মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে। সে ব্যাপারেও শিক্ষিত সমাজ এই মনোভাবেরই পরিপোষক হয়ে ওঠে। তখনকার কালে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির এক লেখা যা এখনও পাঠ্যপুস্তকে আছে, তাতে দেখা যাবে, 'অতঃপর তিনি ব্যাগ নামক একটি বস্তুর মধ্যে দুইখানি বস্ত্র রাখিয়া ভদ্রবেশী মুটে সাজিলেন', অর্থাৎ নিজে সামান্য মালপত্র বহন করা মুটেগিরির সমান। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও বিভিন্ন জুট মিলে যাঁরা পাট থেকে চটের থান বুনতেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বাঙালী। থান বুনতে গেলে গায়ে কালি-ঝুলি লাগে, তাই এখন এই কাজ করে মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের লোকেরা। বাঙালীরা টাইপিষ্ট ও কেরানী—বড়বাবুও হন। যোগেশ ঘোষ ও তারিণী রায় মহাশয়েরা জলপাইগুড়িতে চায়ের ব্যবসার প্রসার ঘটান। কিন্তু সেখানে এক অপূর্ব জিনিস। চা-বাগানের শ্রমিক আগেও আসত, এখনও আসে মধ্যপ্রদেশ থেকে। বলা হয় 'মদেশীয়'। আর বাবুরা সব বাঙালী। আর একটা জিনিস খুব লক্ষণীয়, যা ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে দেখা যাবে না। যে রেলওয়ে ষ্টেশনগুলি পশ্চিম বাংলার মধ্যে, সেই ষ্টেশনগুলিতে যারা মাল বহন করে, তারা সকলেই অন্য প্রদেশের। বাঙালী শ্রমিক নেই বললেই চলে। অথচ বিহারে বিহারী শ্রমিক, উত্তরপ্রদেশে উত্তর-প্রদেশের শ্রমিক, মাদ্রাজে মাদ্রাজী শ্রমিক, গুজরাটে গুজরাটী শ্রমিক। কেবল পশ্চিমবাংলার ষ্টেশনগুলিতেই দেখা যাবে অন্য প্রদেশের লোক শ্রমিকের কাজ করছে। ইংরাজীতে যাকে 'ভাকুয়াম' বলে, তা তো থাকবে না। তাই আমাদের প্রদেশের লোক যদি না পাওয়া যায়, তা হলে নিশ্চয়ই অন্য প্রদেশের লোক আসবে, তারা আমাদের উপকারী। পশ্চিমবঙ্গ কয়লাখনিতে সমৃদ্ধ। বাবুরা অধিকাংশই বাঙালী, আর শ্রমিকরা প্রায় সকলেই অন্য প্রদেশের। এদের মধ্যে যারা ভাল, তাদের বলে 'গোরখপুরিয়া', অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর

থেকে আসে। পশ্চিমবঙ্গে জলকলের যেসব মিস্ত্রী, তাঁরা সকলেই প্রায় অন্য প্রদেশ থেকে আসেন। তাঁরা এসেছেন বলেই জলকল সময়ে মেরামত হয়, অথচ এসব কাজই বাঙালী করতে পারত। নিজের ঘরের কাজ এবং যেগুলো অবশ্য পালনীয় কাজ, সেগুলো বাঙালীরা না করলে তো আটকে থাকবে না, নিশ্চয়ই অন্য প্রদেশবাসী এসে করবে। পুরোনো কথায় যদি যাওয়া যায়, তা হলে দেখা যাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে 'বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক' হয়েছিল। কৃতী ও মানী লোকেরাই এই ব্যাঙ্ক করেছিলেন ; কি[illegible]ই ব্যাঙ্ক টেঁকেনি। কেন টেঁকেনি তার বিশ্লেষণ পণ্ডিত লোকেরা করুন ; কিন্তু টেঁকেনি—এটা বাস্তব সত্য। 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল'ও সেই সময়ে হয়। মাঝখানে নাভিশ্বাস উঠেছিল, এখনও টিঁকে আছে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনকে উপলক্ষ করে গুজরাট বস্ত্রশিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এটাতো গুজরাটীদের কৃতিত্বই বোঝায়। এর জন্য দুঃখ করে লাভ কি ?

ভারতবর্ষের শতকরা সত্তরজন এখনও নিরক্ষর। কলকাতা মহানগরীকে ধরে বাংলা দেশের নিরক্ষরতা একটু কম। উচ্চশিক্ষার আগ্রহও এখানে ঢের বেশী। মাধ্যমিক বা তার নীচের পরীক্ষাতে ফল যাই হোক, কোনরকমে মাধ্যমিক পাস করলেই চেষ্টা শুরু হয়ে যাবে উচ্চশিক্ষার জন্য। এবং নানা-রকম ডিগ্রীও দেখতে পাওয়া যাবে। যেমন, বি-এসসি, বি-এল। যারা পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে পারেনি, তাদের অভিভাবকরাও চেষ্টা করবেন যাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করে। কোন হাতের কাজ শেখা বা কোন শারীরিক পরিশ্রমে লিপ্ত হওয়া—এ অভিভাবকদের চিন্তার বাইরে। ইউরোপে যেসব দেশে নিরক্ষরতা নেই বললেই চলে, সেইসব জায়গায় মাধ্যমিক বা প্রবেশিকা পরীক্ষার পর উচ্চশিক্ষায় শতকরা যত ছেলে মেয়ে যায়, তার চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢের বেশী যায়। আর হাতের কাজে যেখানে দক্ষতা আছে, সেখানেও অবহেলার সীমা নেই। বাংলার তাঁতশিল্প বহু প্রাচীন এবং এর খ্যাতিও পৃথিবী জুড়ে ছিল। এই তাঁতশিল্পে যাঁরা খ্যাত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা ধনী, তাঁরা মহাজনী করেই তাঁদের মোটা লাভের অঙ্ক পুষিয়ে নিতেন।

কোন দিন সুতোর কল করবার চেষ্টা করেননি এবং চিন্তাও করেননি। বিলেত থেকে বা জাপান থেকে সুতো এনে তাঁরা মিহি কাপড় বুনতেন। স্বাধীনতার পর অবশ্য বিলেত থেকে সুতো আসে না। কিন্তু সুতোর কল করার কথা তাঁরা কখনও ভাবেননি। অল্প আয়াসে যে অর্থাগম হয়, তাই তো যথেষ্ট আবার পরিশ্রম কেন? কলকাতার কোন কাগজ ব্যবসায়ীরা এক সময়ে 'পেপার কিং অব এশিয়া' বলে অভিহিত হতেন। কিন্তু কাগজের ক[illegible]ার কথা তাঁরা কোন দিন বোধ হয় চিন্তাও করেননি। বিভিন্ন কাগজের কলের এজেন্সি ছিল, তা থেকেই সমৃদ্ধি। 'বাঙালী কোথায়' বলে খেদোক্তি ভাল; কিন্তু তারপর কি? কিছু দিন আগে কলকাতায় কয়েকজন কৃতী বাঙালীর জীবনী বেরিয়েছিল। তাতে যাঁরা চাকুরিতে উন্নতি করেছিলেন, তাঁদের নামই ছিল। ব্যবসায়ীদের নাম বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না। বাঙালীসমাজে লক্ষ্মীলাভ বলতে বড় চাকুরীই বোঝায়, যেটা পৃথিবীর আর কোনও সমাজে বোঝায় না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অনেক চেষ্টা করেছিলেন। বাঙালীসমাজের প্রতি তীব্র কশাঘাতও করতেন। কিন্তু বিশেষ তো কোন ফল হয়নি। তাঁর সৃষ্ট 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' সরকার অধিগ্রহণ করেছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রসায়ন-বিদ্যায় যত ছাত্র তৈরী করেছিলেন তাঁদের অনেকেই কৃতী। কিন্তু শ্রমবিমুখতার জন্য যে বাঙালীসমাজকে বারবার কশাঘাত করেছিলেন, তাতে কোন কাজ হয়নি।

কৃষিতে এখন আর্থিক সঙ্গতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বহু পরিবার আছেন, যাঁদের জমিতে চাষবাস হয়। কিন্তু সেইসব পরিবারের কর্মঠ ও বলিষ্ঠ তরুণ ও আধাবয়সী ছেলেরা চাকুরির সন্ধানে বেকার হয়ে বসে আছে, কিন্তু নিজেদের জমিতে পরিশ্রম করার কথা ভাবতেও পারে না। ডাঃ রায় কুড়িজন যুবককে সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন, কি[illegible] মূলধন দিয়েছিলেন এবং বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলেন যাতে তারা ঐ সব বাড়িতে চা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে

উনিশজনই সাইকেল ফেরত দিয়েছিল। জেলখানা থেকে আমাদের এক বন্ধু যখন মুক্তি পান আমরা তাঁকে অনেক ঠিকানা দিয়েছিলাম প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করার জন্য। তিনি কৃতী হয়ে একটি দোকানও করেছিলেন। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর ভাই দোকানঘরটি লিজ দিয়ে দেয়। হাওড়া থেকে গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ধরে বরাকর অবধি বাংলাদেশ। দু'ধারে যত খাবারের আর সাইকেল মেরামতের দোকান সব ছিল বাঙালীদের, এখন দেখা যাবে অধিকাংশ ঘরই অবাঙালীদের ভাড়া দেওয়া হয়েছে।' তারা সেখানে [illegible] রোজগার করছে। একটা পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল (সুরেশদার[২] কাছে শোনা)। দিল্লীর রাস্তায় ওঁরা দু'বন্ধুতে বেড়াচ্ছিলেন। কাছেই দুটি ভাল পাঞ্জাবী যুবক রাজমিস্ত্রীদের যোগাড় দিচ্ছিলেন। পেছনে ওঁরা সে সম্বন্ধে বলাবলি করছিলেন। সেই যুবক দুজনের মধ্যে একজন সুরেশদাকে নমস্কার করে বলে যে, সে ইংরাজী জানে, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের ছাত্র। গ্রীষ্মের ছুটিতে কিছু রোজগার করবে বলে দিল্লীতে এসেছে। দু' তিন বছর আগে পুরী যাবার পথে বালেশ্বরের কাছে এক পাঞ্জাবী খাবারের দোকানে আমরা থেমেছিলুম। সেখানে বেশ একটি পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরা ছেলে খাবার পরিবেশন করছিল। ছেলেটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করায় জানা গেল যে, সে বি এ পাস। পরীক্ষা দিয়ে এসে কাকার দোকানে কাজ করছে, যা পয়সা উপার্জন করা যায়। আর বেশী দৃষ্টান্ত দিতে চাই না। খেদোক্তি আমাদের একটা বিলাসিতায় পরিণত হয়েছে। যাঁরা খেদোক্তি করছেন, তাঁরা কি নিজেদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিশ্রমের দিকে কোন দিন উৎসাহ দেবেন অথবা উদ্বুদ্ধ করবেন? ইংরাজীতে একটা কথা আছে, 'ষ্ট্রাগল্ ফর একজিস্টেন্স'। এই ষ্ট্রাগল্ যারা করবে না, তাদের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হতে বাধ্য। নৈরাশ্য বা হতাশা সৃষ্টির জন্য এ লেখা নয়। যাঁদের হাতে ক্ষমতা আছে ও সংবাদপত্র আছে, তাঁরা যদি কিছু আশার আলোক দেখাতে পারেন, তা হলেই 'বাঙালী কোথায়'—এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। ★

১। যুগান্তরে
২। সুরেশচন্দ্র মজুমদার ★ দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত।

১.　বেকার সমস্যা ও বাঙালী

২.　কে কী ভাবছেন

গান্ধীবাদী রাজনৈতিক নেতা

মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক নেতা

শিল্পপতি

শ্রমিক নেতা

শ্রমমন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী

সমাজসেবী

বিচারপতি

শিক্ষাবিদ

লেখক

সাংবাদিক

রাজনীতিবিদ

বেকার সমস্যা ও বাঙালী

বেকার সমস্যাই বোধহয় এখন দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। দিনে দিনে এর চেহারা হয়েছে সুন্দরবনের মতো জটিল, হিমালয়ের মতো বিশাল, জৈষ্ঠ্যের সূর্যের মতো জ্বলন্ত, বারুদস্তূপের মতো ভয়ঙ্কর। স্বাধীনতার পর এই সমস্যাটি গুণিতক নিয়মে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আজ, স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পর এর চেহারা সত্যিই ভয়াবহ। কত যে ভয়ঙ্কর, তা জানা যাবে সম্প্রতি প্রকাশিত কিছু সরকারী তথ্য থেকে।

১৯৪৭ সালে সারা ভারতে বেকারের সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ। আর এখন তা বেড়ে হয়েছে ২ কোটি ৮০ লক্ষ। এক পশ্চিমবঙ্গেই বেকার ২১ লক্ষ ৯৯ হাজার। এ হল সরকারী হিসাবের খাতা থেকে পাওয়া তথ্য। খাতায় নাম না লেখানো বেকারের সংখ্যা আরও চারগুণ বেশি। তবে নতুন নতুন চাকরির সুযোগও যে তৈরি হয়নি, তা নয়। এই পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালের তুলনায় ১৯৭৮ সালে চাকুরি পাওয়া লোকের সংখ্যা বেড়েছে ০.৩ শতাংশ। অন্যদিকে এই একই সময়ে এই রাজ্যে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ২৬ শতাংশ। ১৯৭৮ সালে যেখানে রেজিস্টার্ড বেকারের সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫২৯, সেখানে ১৯৭৯ সালে হয়েছে ২১ লক্ষ ৮ হাজার ৪৯৭। অর্থাৎ এক বছরে চাকরি কমেছে দেড় হাজারের ওপর আর বেকার বেড়েছে সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি।

বাইশ লক্ষ বেকারের মধ্যে নয় লক্ষ (মোট পঞ্জীভুক্ত বেকারের ৪৫ শতাংশ) শিক্ষিত। এই শিক্ষিতদের তালিকায় স্কুল ফাইন্যাল থেকে এম-এ, এম এস সি সবই রয়েছেন। ওই, নয় লক্ষ শিক্ষিত বেকারের মধ্যে সাত লক্ষই আনডার গ্র্যাজুয়েট। আটাত্তরে পুরুষ বেকারের সংখ্যা ছিল ১৫,২৩,৫১১। এক বছরের মধ্যে প্রায়, তিন লক্ষ বেড়ে পুরুষ বেকারের সংখ্যা উনসত্তরে হয় ১৮,০৯,৪৭৩। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১৮.৮ শতাংশ। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার প্রায় ডবল—৩২.৩ শতাংশ। আটাত্তরে মহিলা বেকারের সংখ্যা ছিল ২,২৬,০১৮ আর গত বছর ওই সংখ্যা বেড়ে হয় ২,৯৯,০২৪।

অবস্থাটা আরও ভয়াবহ মনে হয়, যখন দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে ফি বছর যে যৎসামান্য নতুন চাকরি সৃষ্টি হয় তার এক তৃতীয়াংশেও লোক নিয়োগ হয় না। রাজ্য সরকারের শ্রম দফতর থেকে প্রকাশিত "লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৭৯" গ্রন্থে সরকার নিজেই এ কথা কবুল করে বলেছেন, ১৯৭৮ সালে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় "ঘোষিত শূন্যপদের" সংখ্যা ছিল ৪৬,০৭২ আর ওই বছর বেকাররা চাকরি পেয়েছিলেন ১৫,৫১৮ জন। আর গত বছর "ঘোষিত শূন্যপদের" সংখ্যা যেখানে ছিল ৪৪,৫৫১ সেখানে চাকরি পেয়েছিলেন ১৫,৫৯১ জন।

সাতাত্তর সালে এ রাজ্যে কর্মরত মানুষের সংখ্যা (কৃষি ও বাগিচা বাদে) যেখানে ছিল ২৫,০৭,৪৯০ সেখানে আটাত্তরে ছিল ২৫,১৬,৬০১। এক বছরে ৯,১১১ জন চাকরি পেয়েছেন। ১৯৭৮ সালে বিভিন্ন দফতরে ১০ হাজারের মত পদ খালি ছিল। এর মধ্যে ৩,৮০৪টি পদে লোক নিযুক্ত হয়। ১৯৭৯ সালে খালি ছিল ১৬,৬৫৬টি পদ, নিযুক্ত হন ৬,৬৫৮ জন। অর্থাৎ রাজ্য সরকার পর পর দু' বছরই এক চতুর্থাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশের সামান্য কিছু বেশি শূন্য পদে লোক নিয়োগে সক্ষম হয়েছেন। তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকারের শূন্য পদে লোক নিয়োগের সংখ্যা অনেক বেশি। আটাত্তরে শূন্য ৫১২৬টি কেন্দ্রীয় পদে ২৫৪৫ জন নিযুক্ত হন। পরের বছর, উনসত্তরে ৫৭২৯টি শূন্য পদে ২২৭৫ জন নিযুক্ত হন। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে ৫০ শতাংশ পদ পূরণে সক্ষম হয়েছেন।

বেসরকারী সংস্থায় লোক নিয়োগের অবস্থা রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারের তুলনায় ঢের বেশি করুণ। আটাত্তরে ১৬,৬৩২টি শূন্য পদের মধ্যে ৫৪৯২টি পদে লোক নিযুক্ত হন। আর উনসত্তরে ১০,৫৪৪টি শূন্য পদের মধ্যে মাত্র ১৭০৭টি পদে লোক নিযুক্ত হন।

এই রাজ্যের সরকারী প্রশাসনেও এই রাজ্যের মানুষ সংখ্যালঘু। অবশ্য আমি রাজ্য প্রশাসনের উঁচু মাপের চাকুরিয়াদের কথাই বলছি। আই এ

এস ও আই পি এস পর্যায়ের অফিসারদের বেশিরভাগই অবাঙালী। গত পাঁচ বছরে মাত্র ৭ জন ওই পর্যায়ের বাঙালী অফিসার এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ১৫টি জিলায় শতকবা ৯০ ভাগ পুলিশ সুপার অবাঙালী। এখন মাত্র ৩ জন বাঙালী পুলিশ সুপার আছেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের ৩০টি পদের মধ্যে বাঙালী মাত্র ৮ জন। মহকুমা পুলিশ অফিসারদের অর্ধেকই অবাঙালী। রাজের ১৫টি জেলার মধ্যে মাত্র ৬টি জিলার জেলাশাসক বাঙালী। বাকী সবাই অবাঙালী। মহাকরণে সচিব পর্যায়ে শতকরা ৭০ ভাগ অফিসারই অবাঙালী। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের চারটি রেঞ্জের ডি আই জি-দের দু'জনেই অবাঙালী। এছাড়া ডি আই জি এনফোর্সমেণ্ট ও ডি আই জি হোমগার্ডের পদ দু'টোও অবাঙালীদের দখলে। কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনারদের ৪০ শতাংশ অবাঙালী। জয়েণ্ট পুলিশ কমিশনারও একজন দাক্ষিণ ভারতীয। আই বি-র স্পেশাল সুপারিটেনডেণ্টও একজন অবাঙালী অফিসার।

সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত, এখন যেমন চলছে যদি ঠিকঠাক সেইরকম চলতে থাকে, তাহলে আগামী ৬ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৮৭ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আই জি হবেন একজন অবাঙালী। ওই সময়ের মধ্যেই সচিব পর্যায়ের শতকরা ৮০ জন অফিসার হবেন অবাঙালী। রাজ্যের প্রশাসনে অবাঙালী অফিসারদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দক্ষিণ ভারতীয়রা। তারপরেই পাঞ্জবীদের স্থান। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের লোকও কিছু আছেন। নেই কেবল বাঙালী, যতটা থাকা উচিত ছিল।

এই ছবি আসলে সামান্য একটি রেখাচিত্র। সরকারী হিসাবেই যখন এসব কথা বলা হচ্ছে, তখন এ থেকে অন্ততঃ এটুকু বোঝা যাবে যে, বেকার সমস্যার আসল চেহারাটা কী রকম! এই হিসাবের খাতা থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট বোঝা গেল। এক, পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, কাজের সুযোগও তেমনি তুলনামূলকভাবে কমেছে। দুই, কলে কারখানায় অফিসে পশ্চিমবঙ্গেই বাঙালী শ্রমিক ও কর্মীর সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। বাড়ছে

অন্য রাজ্যের শ্রমিক ও কর্মীর সংখ্যা। কেন এমন হবে? এমন হওয়া কি উচিত? অন্য রাজ্যে কি হচ্ছে? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে পশ্চিমবাংলায় বেকার সমস্যার কারণগুলি খতিয়ে দেখতে হবে গোড়া থেকে। গোড়া বলতে বোঝাতে চাইছি সাতচল্লিশের স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের পর থেকে।

স্বাধীনতার এক ভিন্ন অর্থ আছে আমাদের কাছে। দেশ বিভাগের প্রত্যক্ষ বলি আমরা বাঙালীরা। দেশ বিভাগের দরুন কেবল অর্থ নৈতিক দুর্গতিই যে হঠাৎ করে বেড়ে গেল তাই নয়, হঠাৎ করে জনসংখ্যার চাপও বেড়ে গেল। প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ এলো পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এই বঙ্গে। এর মধ্যে আন্দামান, দণ্ডকারণ্য ও অন্যত্র মাত্র আড়াই লক্ষ লোকের জায়গা হল। বাকি সকলেই থেকে গেল পশ্চিমবঙ্গে। এই যে হঠাৎ করে লোকসংখ্যা এইভাবে বেড়ে গেল, এটা কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা নিশ্চয়ই নয়। দিল্লির মসনদে যাঁরা বসলেন, পশ্চিমবঙ্গের রূপোর সিংহাসনেও যাঁরা অধিষ্ঠিত হলেন, এসব ঘটনা তাঁদের হাতেই ঘটেছে। ঘটনার জের চলেছে তাঁদেরই চোখের সামনে। কাজেই, পশ্চিমবঙ্গের জন্য যাবতীয় পরিকল্পনার ব্যাপারে দেশবিভাগের পরিণামের কথাটি সবার আগে বিবেচনা করা উচিত ছিল। তা করা হয়নি। স্বাধীনতার এই 'পুরস্কার' অন্য রাজ্যের ভাগ্যে জোটেনি। জুটেছে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে। এই পশ্চিমবঙ্গের জন্য তাই আলাদা করে বিচার বিবেচনার প্রয়োজন ছিল। তা করা হয়নি। দিল্লি থেকে যে সব উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছিল, তাতে পশ্চিমবঙ্গের এই বিশেষ অবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। হঠাৎ করে চলে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষের চাকরি, এক দশক পরে নতুন প্রকল্পের জন্য আরও কর্মসংস্থান—এসব কথা ঘুর্ণাক্ষরেও ভাবা হয়নি।

তবে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য একটি আলাদা দপ্তর খোলা হয়েছিল। কোটি কোটি টাকা খরচও হয়েছে। কিন্তু আজও কি সবাই যথাযথ পুনর্বাসন পেয়েছেন? এর উত্তর, নিশ্চয়ই না। আর যাদের পশ্চিমবাংলার বাইরে পাঠানো হয়েছিল, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। দণ্ডকারণ্য থেকে

উদ্বাস্তুরা চলে আসতে পারলেই বাঁচে। আন্দামানেও স্বস্তিতে নেই। আসামে তো বাঙালী উদ্বাস্তুরা এই তেত্রিশ বছর পর হঠাৎ বিদেশী বনে গেল। কাজেই সরকারী ব্যবস্থায় আজও উদ্বাস্তুরা উদ্বাস্তুই রয়ে গেল। ভারতের স্বাধীন নাগরিকের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসতে পারল না। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গীই পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যার মোকাবিলায় সুষ্ঠু ও যথার্থ কার্যক্রম গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। দেশ বিভাগ কেবল বাংলায় নয়, পাঞ্জাবেও হয়েছে। বাঙালীদের মত পাঞ্জাবীদেরও একই দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছে। অথচ দেখা যাচ্ছে, পাঞ্জাবীরা যত সহজে এই ক্ষত নিরাময় করে তুলতে পেরেছে, বাঙালীরা তা পারেনি। এর জন্য দায়ী কে? পাঞ্জাবীরা যা পারল, বাঙালীরা তা পারল না কেন? বাঙালীরা পারেনি, পাঞ্জাবীরা পারল, তার জন্যও কিন্তু দায়ী 'দক্ষ বাজিকর' কেন্দ্রীয় সরকার। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার দেশের দুই প্রান্তের উদ্বাস্তুদের জন্য কার্যত দু'রকম নীতি নিয়েছিলেন। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে সম্পত্তি বিনিময় কার্যত করা হয়েছে। বাংলার ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে মাথা পিছু যে পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে, বাঙালী উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম। তৃতীয়ত, পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের দায় অল্পবিস্তর বহন করেছে প্রায় সব রাজ্যই। এমন কি, খণ্ডিত বাংলা এই পশ্চিমবঙ্গ, যার নিজের ঘাড়েই ছিল ৫০ লক্ষ উদ্বাস্তু, সেই রাজ্যেও ঠাঁই হয়েছে পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের। কিন্তু বাঙালী উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে এই উদারতা লক্ষ্য করা যায়নি। বহু কষ্টে এক অরণ্য খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, যেখানে এক লাখ উদ্বাস্তুকে দেওয়া হয়েছে নির্বাসন দণ্ড। তা না হলে আজও দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন একটা সমস্যা হয়ে রইল কেন? মোট কথা, স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের এই বাড়তি সমস্যার কথাটা ধরে নিয়ে সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বেকার সমস্যার সমাধান অর্থাৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর কোন চেষ্টাও এই দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়নি।

স্বাধীনতার পর নতুন শিল্পনীতি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কোন শুভ পরিণতি নিয়ে আসেনি। শিল্পের অবস্থা যা ছিল, তার উপর যদি অন্যান্য রাজ্যের হারে

শিল্পের বিকাশ ঘটতো তা হলে পশ্চিমবঙ্গ যেমন শিল্পে তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারত। কার্যত ঘটলো ঠিক বিপরীত। স্বাধীনতার পরেই দিল্লি থেকে আওয়াজ এল, শিল্পের সুসম বিকাশ চাই। আর তার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হল। এক, পশ্চিমবঙ্গ তো শিল্পে এগিয়েই আছে। কাজেই এবার পশ্চিমবঙ্গের বদলে অন্য রাজ্যে শিল্প গড়ার দিকে বেশি নজর দেওয়া হোক। উদ্বাস্তু প্রপীড়িত পশ্চিমবঙ্গের জন্যও যে শিল্পে অধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার, এটা কেন্দ্রীয় কর্তারা বুঝতে চাইলেন না। রাজ্য সরকারের হুকুমবরদাররাও বুঝতে চাইলেন না। দুই, শিল্পের সুসম বিকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কয়লা, পূর্বাঞ্চলের লোহা ও ইস্পাতের দামে সমতা আনা হল। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চল তার নিজস্ব প্রাকৃতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হল। তিন, কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় যেসব অর্থলগ্নী সংস্থা গড়ে উঠল তাদের বলা হল 'শিল্পোন্নত' পশ্চিমবঙ্গের বদলে অন্য রাজ্যে শিল্প গড়ায় বেশি করে অর্থলগ্নী করতে। এর উপর রইল কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব ক্ষমতা। কেন্দ্রীয় সরকারই শিল্প গড়ার অনুমোদন দেওয়ার মালিক। কাঁচা মাল বরাদ্দ ও বণ্টনের মালিক। আমদানি রপ্তানির অনুমতি দেওয়ার মালিক। কেন্দ্রীয় সরকার এই সব ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সুবিচার করেননি। শিল্পসমীক্ষায় আমরা তা দেখিয়েছি। স্বাধীনোত্তর কালে এই নতুন শিল্পনীতির নীট ফল, পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। প্রথম থেকে এখন নেমেছে তৃতীয় স্থানে। এক দুর্গাপুর ছাড়া বড় কোন শিল্পের পত্তন এ রাজ্যে হয়নি। এমন কি, যে সব শিল্প পশ্চিমবঙ্গে হওয়ার কথা, সে সব শিল্প স্থাপনের জন্য বিশেষজ্ঞরা পশ্চিমবঙ্গকেই উপযুক্ত স্থান বলে নির্দেশ করেছেন, সেগুলিও আজ হবে কাল হবে করে এখনও হয়নি। শুধু হয়নি তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছায় সেইসব শিল্পের অনেকগুলিই ইতিমধ্যে অন্য রাজ্যে হতে চলেছে। কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। গত পনের বছরে এক পাতাল রেল ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে আর কোন ক্ষেত্রে একটি পয়সাও বিনিয়োগ করেননি। এই অবস্থায়, পশ্চিমবঙ্গে গত তেত্রিশ বছরে শিল্পের প্রসার প্রত্যাশিত পথ ধরে না চলায় স্বভাবতই কর্মসংস্থানের সুযোগ তেমন বাড়েনি।

অন্যদিকে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে।[১৫] যোগবিয়োগের মাঝখান থেকে বেকার সমস্যা হয়েছে ব্যাপকতর।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় বিচার করে দেখা দরকার। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের পটপরিবর্তনে বাঙালীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই কথাটি বলতে গেলেই অনেকে প্রাদেশিকতা বলে হৈ চৈ বাঁধিয়ে দেন। তাঁরা ভুলে যান প্রাদেশিকতা ব্যাপারটা এক তরফা হয়না। বাঙালীকে বাদ দেওয়ার সচেতন প্রচেষ্টাও প্রাদেশিকতা। সে কথা, অপ্রিয় সত্য হলেও, বলাটা মোটেই প্রাদেশিকতা নয়। কেননা, নিজের ভাল পাগলেও বোঝে। অন্য রাজের লোকেরাও বোঝে। বাঙালীরাই বা বুঝবে না কেন? স্বাধীনতার পর চা থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পর্যন্ত যাবতীয় শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় সবটাই চলে যায় অবাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের হাতে। ইংরাজদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে মাড়োয়ারি গুজরাটীরা পশ্চিমবঙ্গে জাঁকিয়ে বসল। বাঙালীর হাতে যা ছিল, তাও দেশ বিভাগের সর্বনাশা স্রোতে ভেসে যায়। অবাঙালীদের হাতে ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পের বেশির ভাগটাই চলে যাওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাড়াও অন্য রকম অসুবিধাও দেখা দিল। এক, অবাঙালী মালিকরা অতঃপর নিয়োগের ক্ষেত্রে বাঙালীর চেয়ে অবাঙালী (দেশোয়ালি?) কর্মী নিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং এখনও দেখাচ্ছেন; দুই, বড় বড় শিল্পের চাহিদা মেটাতে যে সব ছোট ছোট সহায়ক শিল্প সংস্থা থাকে, সেগুলি যাতে অবাঙালীরাই গড়ে তুলতে পাবে তারজন্যও বিশেষভাবে চেষ্টা চালানো হয়েছে। এর ফলে ছোট শিল্পে বাঙালীর সমূহ বিনাশ হল। কেননা, বাঙালীদের একটা বড় আশ্রয় ছিল এই ছোট সহায়ক শিল্প। কিন্তু অবাঙালী শিল্পপতিদের কাছ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ায় এ ক্ষেত্রেও বাঙালীদের অসহায়ভাবে মার খেতে হয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, সরকারী উদ্যোগে গড়ে তোলা দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে সহায়ক শিল্পে আজ অবাঙালীরাই অগ্রগন্য। তিন, এই বাংলায় শিল্প অবঙালীদের হাতে যাওয়ায় বাঙালীদের কাজের সুযোগ হ্রাস পেল। এসব হওয়ার কথা

নয়। কিন্তু কার্যত, এসব হয়েছে। হয়ে চলেছে। এসব কথা বলা কি প্রাদেশিকতা ?

এই রাজ্যে ভয়াবহ বেকার সমস্যার কারণ সম্পর্কে রাজনীতিকরা সবাই একমত না। না হওয়াই স্বাভাবিক। যে দল স্বাধীনতার পর কেন্দ্রে ও রাজ্যে শাসন চালিয়ে এসেছেন, তাঁরা কি এখন বলতে পারেন, আমাদের সুশাসনেই এই অবস্থা হয়েছে ? বামপন্থী রাজনীতিকরাও কি বলতে পারবেন, শাসক-দলের অন্ধ বিরোধিতার জন্যই আন্দোলনের নামে অনেক অবিবেচনার কাজ করা হয়েছে ? সুখের কথা, অনেক বামপন্থী ট্রেডইউনিয়ন নেতা এখন স্বীকার করছেন যে, শ্রমিক আন্দোলনের নামে অনেক অন্যায্য আন্দোলন করা হয়েছে। তাতে শিল্পের ক্ষতি হয়েছে, অনেক তরুণ সংগ্রামী নেতাকেও এখন বলতে শোনা যায়, এত বছর ধরে এই রাজ্যের প্রতি সত্যিই সুবিচার করা হয়নি। এই বোধ বিলম্বে হলেও ভাল কথা। কিন্তু, ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। আর এই ক্ষতির পূরণ খুব সহজে হবার নয়।

গান্ধীবাদী রাজনৈতিক নেতাদের মতে পশ্চিমবঙ্গে এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার মূল কারণ দু'টি—(১) জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি (২) বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির অযৌক্তিক আন্দোলন। বেশিরভাগ গান্ধীবাদী নেতার ধারণা, জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়নি। শিল্পের ও কৃষির বিকাশ যতটা হয়েছে, তার ফলে, কাজের সুযোগ যতটা বেড়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি গুণ বেড়েছে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা। এটা যুক্তি হিসাবে তেমন টেকসই নয়। তাহলে, চীনে বেকার নেই কেন ? সেখানে তো জনসংখ্যা ভারতের দেড়গুণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও ভারতের চেয়ে বেশি। অথচ সেখানে বেকার সমস্যা আদৌ কোন সমস্যা নয়। যদি ধরেও নেওয়া যায়, চীনে একেবারে বেকার নেই, এই কথা সত্যি নয়, তাহলে এতে নিশ্চয়ই কেউ আপত্তি করবেন না যে, সেই সমস্যা ভারতের মত এত ব্যাপক নিশ্চয়ই নয়। জনসংখ্যার বৃদ্ধি

ঘটবে, এটা ধরেই নিয়েই অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিকল্পনাগুলি করা উচিত ছিল। তা যে করা হয়নি, অধুনা অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্রই তার প্রমাণ। এঁরা এই সঙ্গে আরও একটি কারণ উল্লেখ করে থাকেন। অর্থনৈতিক মন্দা বিশ্ব জুড়ে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর থেকেই এই মন্দা ক্রমে তীব্র হয়ে উঠেছে এবং এখনও অব্যাহতগতিতে চলছে। ভারতের অর্থনৈতিক মন্দার অবস্থাটা এর থেকে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কাজেই সেই অনিবার্য অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতেই বেকার সমস্যা এত তীব্র হয়েছে। এই যুক্তি অসার নয় কিন্তু আমরা দেখেছি স্বাধীনতার পর ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা এবং শিল্পের সুসম বিকাশের নামে কার্যত পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবহেলা এই রাজ্যের বেকার সমস্যাকে এত ভয়াবহ করে তুলেছে। গান্ধীবাদী নেতাদের দ্বিতীয় অভিযোগ, বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শিল্পের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আর এর ফলে কাজের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনাও যথেষ্ট পরিমানে কমেছে। এই অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। তবে অযৌক্তিক শ্রমিক আন্দোলন শিল্পের বিকাশের পথ যতটা রুদ্ধ করেছে, ত্রুটিপূর্ণ শিল্প-নীতির তুলনায় তা খুব বড় নয়। স্বাধীনতার পর ঘন ঘন শ্রমিক আন্দোলন কোন কোন ক্ষেত্রে বিপর্যয় এনেছে সন্দেহ নেই। কলকাতা বন্দরের বর্তমান বেহাল অবস্থার জন্য এই ধরনের শ্রমিক আন্দোলনকে কিছুটা দায়ী করা চলে। এই রাজ্যের শ্রমিকদের এই তথাকথিত আন্দোলনের মূল কারণটি কি? এ নিছক দাবিদাওয়ার আন্দোলন নয়। নিছক রাজনৈতিক কারনেই এসব আন্দোলন সংঘটিত হয়নি। এর পেছনে আছে পর্বত প্রমাণ হতাশাবোধ। স্বাধীনতার আগে শ্রমিকরা যেসব আন্দোলন করেছেন, তার পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল—বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। অবশেষে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে আমরা জয়ী হলাম। দেশ স্বাধীন হল। তখন অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের মতই শ্রমিক শ্রেণীরও অনেক প্রত্যাশা ছিল। তাঁরাও ভেবেছিলেন, এবার আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। কার্যত, তা হল না। ইংরাজ আমলের শ্রমিক শোষণের চেহারাটাই থেকে গেল স্বদেশী পোষাকে। অতএব, শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। স্বাধীনতার

এক দশক পর থেকে তাই শ্রমিক অসন্তোষ, আন্দোলন, ধর্মঘট তীব্র হয়ে উঠল। শাসক সম্প্রদায় শ্রমিকশ্রেণীর এই মানসিকতা ধরতে পারেননি। তবু বলব, শ্রমিক অসন্তোষ শিল্পের প্রসারে খুব বড় অন্তরায় নয়।

বামপন্থী রাজনীতিকদের মতে পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যার জন্য দায়ী—(১) কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাগুলির ত্রুটি; (২) পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্বাঞ্চলের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উপেক্ষা। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাগুলির ত্রুটির কথা আগেও কিছু বলা হয়েছে। বামপন্থী রাজনীতিকদের মতে প্রধান ত্রুটি হল, পরিকল্পনাগুলি মানুষের কল্যাণমুখী করে রচনা করা হয়নি। কেবল উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে শিল্পনীতি গড়ে তোলা হয়েছে, যে উৎপাদন কেবলমাত্র মুনাফা অর্জনের জন্যই। জনকল্যাণমুখী উৎপাদন ব্যবস্থার অর্থ হল মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে তা গড়ে তোলা। অর্থাৎ ওই উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বার্থও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকবে। কিন্তু এইসব পরিকল্পনায় তা হয়নি। মুনাফা লাভের দিকে লক্ষ্য থাকায় শিল্পে নিযুক্ত হলেও মানুষগুলির স্বার্থ এতে জড়িত হতে পারেনি। ফলে, এই সব পরিকল্পনা মানুষের কোন কল্যাণ করেনি। সেইজন্যই দেখা যায় দেশের আভ্যন্তরীন শিল্পবাজার তেমন বড় হতে পারেনি। উৎপাদন তাই ক্রমশ রফতানি-নির্ভর হয়ে পড়েছে। এইসব ঘটনার মোদ্দা কথাটি হল, পরিকল্পনাগুলি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহায়ক হয়নি। ফলে, মানুষের কাজের সুযোগও সেই পরিমানে বাড়েনি। এঁরা এই সূত্রেই আরও একটি ত্রুটির কথা বলেছেন। দেশের শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। লাভের জন্যই শিল্প, এই নীতিকে নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এই নীতি এসে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছিয়েছে, যার পর আর শিল্পের কোন বিকাশ হচ্ছে না। মানুষের প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের আর একটি বড় উদাহরণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার। যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার, ক্রমশ বেকারের সংখ্যা বেড়েই

চলেছে, সে দেশে আধুনিকীকরণের নামে অতিসূক্ষ্ম যন্ত্র ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে যাওয়া আত্মহত্যারই সামিল। অথচ সচেতনভাবে ঠিক তাই করা হচ্ছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাগুলির মধ্যে অঞ্চল বিশেষের প্রতি অবহেলার নজিরও আছে। এটাও একটা বড় ত্রুটি। আর এর ফল সবচেয়ে বেশি করে ভোগ করতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে।

বামপন্থী রাজনীতিকদের আর একটি প্রত্যক্ষ অভিযোগ হল, কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্বাঞ্চলের প্রতি ধারাবাহিক উপেক্ষা। কয়লার দামে, লোহা ও ইস্পাতের দামে সমতা এনে একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের স্বাভাবিক সুবিধা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তেমনি শিল্পের প্রয়োজনে গুজরাটের তুলা বা বোম্বাইয়ের রাসায়নিক দ্রব্যের আমদানির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্বাঞ্চলকে কোন রকম সুবিধা দেওয়া হয়নি। ফলে, ওইসব শিল্পের প্রসার এই রাজ্যগুলিতে হয়নি। না হওয়ায় নতুন কাজের সুযোগ বাড়ানো যায়নি। এই ভাবেই ভেষজ শিল্পে একদা অগ্রগণ্য পশ্চিমবঙ্গ এখন সবার পিছনে। কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবের ফলেই, যে ইলেকট্রোনিক শিল্পের পত্তন এই কলকাতা শহরে, সেই শিল্পের বিকাশ ঘটল অন্য রাজ্যে। কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবের ফলেই পশ্চিমবাংলার ইনজিনীয়ারিং শিল্প এখন মরণোন্মুখ। বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুকূল থাকা সত্ত্বেও হলদিয়ায় সার কারখানা, জাহাজ নির্মাণ কারখানা পশ্চিমবাংলায় হয়নি। এই রকম আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। চর্মশিল্প, কাচশিল্পও পশ্চিমবঙ্গের হাত ছাড়া হয়ে গেল। রপ্তানি বাণিজ্যে কলকাতা বন্দর অচল করা হল পশ্চিমের কাণ্ডালা বন্দরের স্বার্থে। এইসব উদাহরণ থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট, স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের প্রসার প্রায় কিছুই হয়নি। না হওয়ায় নতুন প্রকল্পের পক্ষে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়েনি। বেকার সংখ্যা তাই ক্রমবর্ধমান।

তিন তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ এতদিনে শেষ হয়েছে। খরচ হয়েছে ১ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু এখনও দেশের শতকরা ৭০ জন মানুষ দারিদ্র্যসীমার

নীচে রয়েছে। দেশের শতকরা ৮০ জন মানুষ গ্রামে বাস করে। সবুজ বিপ্লব সত্ত্বেও গ্রামের মানুষজনের আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়েনি। মোটা ভাত কাপড়ের পর অতিরিক্ত ভোগ্যপণ্য কেনার মত টাকা বেশির ভাগ মানুষের না থাকায় শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বাড়েনি। আর এই কারণেই শিল্পের আভ্যন্তরীণ বাজার গড়ে ওঠেনি। একটা নির্দ্দিষ্ট সীমানার পর শিল্পের প্রসার আর ঘটেনি। স্বভাবতই কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়েনি। কৃষি ও শিল্প দুই ক্ষেত্রেই যখন এই স্থিতাবস্থা, তখন আরও বেশি সংখ্যায় মানুষের জন্য কাজের ব্যবস্থাও একটি বিন্দুতে এসে স্থির হয়ে আছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষারোপ করাটাই যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতার পর উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এই রাজ্যের মানুষজনের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে তদানীন্তন রাজ্য সরকারের ভূমিকাও কম দায়ী নয়। বস্তুত, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার সরকারী বাসে বাঙালী কনডাক্টার বা বাঙালীদের জন্য ট্যাক্সির পারমিট দেওয়ার মত খুচরো কিছু কাজ করা ছাড়া আর কিছুই করেননি। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল আসলে অবাঙালী ব্যবসায়ীদেরই মুনাফা অর্জনের প্রশস্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বড় বড় শিল্পগুলি অবাঙালীদের হাতে চলে যাওয়ার অনিবার্য গতিকে রোধ করা সম্ভব হয়নি। রাজ্য সরকারের হাতে ছিল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গোটাটাই ছিল বাঙালীদের হাতে। ক্রমে ক্রমে তার প্রায় ৮০ ভাগই অবাঙালীদের হাতে চলে যায়। কুটির শিল্পের মধ্যে তাঁত ও পাওয়ারলুমের অবস্থাটা দেখা যাক। তাঁতীদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়েছে। পাওয়ারলুম বাঙালীদের হাতেই দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার অন্ত্যেষ্টি হতে বেশি দিন লাগেনি। এর কারণ কি? মূল কারণ, তাঁত ও পাওয়ারলুমের জন্য যে সুতো চাই তা আসে প্রধানত অন্য রাজ্য থেকে। এই সুতো আমদানি ও বণ্টনের পুরো দায়িত্ব অবাঙালী ব্যবসায়ীদের। স্বভাবতই, বাঙালীরা এইসব অবাঙালী ব্যবসায়ীদের শিকারে পরিণত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকা ছিল নির্বাক দর্শকের। কৃষি ক্ষেত্রে কাজের

সুযোগ বাড়াতে হলে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। জমিদারী উচ্ছেদ থেকে শুরু করে ভূমি সংস্কারের নামে অনেক আইন পাশ হল, কিন্তু একটাও কার্যকর হয়নি। ফলে, কয়েকজন ভূস্বামীর হাতেই থেকে গিয়েছে রাজ্যের ৭০ ভাগ জমি। রাজ্যের কৃষি ও শিল্পের বিকাশে রাজ্য সরকার তার ভূমিকা ঠিকঠাক পালন করতে পারেননি। কয়লার দামের সমতা বিধানের প্রস্তাবে রাজি হয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ই বাঙালীর চিরস্থায়ী সর্বনাশের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। সময়মত গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের পরিকল্পনা নিতে না পারাটাও বিধানবাবুর আর একটি ত্রুটি। বিধানবাবুর সরকারের হঠকারিতার ফলেই আধুনিক ভেষজ শিল্প বঙ্গোপসাগর থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে আরবসাগর তীরে।

এই রাজ্যের বেকার সমস্যার তীব্রতার জন্য বাঙালীদেরও কিছু অবদান আছে। নিজেদের দোষত্রুটির কথাও বলা ভাল। এটা আত্মনিন্দার প্রয়াস নয়, বরং বলা যেতে পারে আত্মসমীক্ষা, যা পরবর্তীকালের যুবসম্প্রদায়ের কাছে সঠিক নিশানা বলে গণ্য হতে পারে। একথা ঠিকই, বাঙালীরা কেউ স্বেচ্ছায় ও আগ্রহের সঙ্গে কঠিন শ্রমের কাজগুলি করতে রাজি নয়। ফলে, পশ্চিমবঙ্গের চাকরির একটা বিরাট অংশ অবাঙালীরা দখল করে বসে আছে। এটা নতুন ঘটনা নয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাও নয়। এটা শতাব্দী কালের এক ব্যবস্থা, যা স্বেচ্ছায় আমরা নিজেরাই তৈরি করেছি। অবাঙালীরা এইসব ক্ষেত্রে এমন সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে যে, সেইসব জায়গায় শূন্যপদে তাঁদেরই আত্মীয় পরিজন ভাই বেরাদর দেশোয়ালি লোকজন চাকরি পায়, বাঙালীর চাকরি হয় না। এবং এই ব্যবস্থায় মদত জুগিয়ে থাকেন একদিকে সরকার, অন্যদিকে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি।

বাঙালীদের মানসিকতার আর একটি লক্ষণ হল, চালাকিরদ্বারা মহৎকার্য সাধন। অর্থাৎ ফাঁকি দেওয়ার একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যে কেরাণীর চাকরিতে বাঙালীর একদা আধিপত্য ছিল, এখন তা কমে এসেছে। আরও কমছে। কাজ না করা অথচ বেতনের আন্দোলনে বিপ্লবী ভূমিকা

পালনের স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। এর ফলে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাঙালী কেরাণী নিয়োগের আগ্রহ নিয়োগকর্ত্তাদের প্রায় নেই বললেই চলে। সরকারী অফিসের কেরাণীকুলও বেশির ভাগই যথেষ্ট কাজ না করে কড়ায়গণ্ডায় বেতন বুঝে নেওয়ার জন্য তৎপর। সরকারী কাজের নমুনাই তার প্রমাণ। বাঙালীর এই ধরণের মানসিকতায় ক্ষতি হয়েছে বাঙালীর নিজেদেরই। আর এরই সুযোগ নিয়ে তামাম হিন্দুস্তানের লোক নানা ধরণের কাজকর্মে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্চে।

পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিলে ভারতের আর সব রাজ্যের মানুষের মধ্যেই তাঁর রাজ্যের মানুষের প্রতি দরদ, সহযোগিতার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। বাঙালীদের মধ্যে স্বজনপোষন তো দূরের কথা, স্বজনশ্রীকাতরতাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত কোন বাঙালী অফিসার বাঙালী কর্মপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে কোন আনুকূল্য দেখান না। কিন্তু অন্য রাজ্যের লোকেরা তা করে থাকেন একটি পবিত্র কর্তব্য হিসাবে। এ ব্যাপারে ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন বাঙালী উদ্যোগীদের প্রায় সকলেরই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁরা বাঙালী অফিসার বা বাঙালী শিল্পপতি ব্যবসাদারদের কাছ থেকে কমই সাহায্য পেয়ে থাকেন। অথচ অন্য রাজ্যের কোন অফিসার বা ব্যবসায়ী শিল্পপতি তাঁর রাজ্যের বা তাঁর জাতের একজন নতুন ব্যবসায়ীকে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকেন। বাঙালীদের এই ধরণের মনোভাবকে অবাঙালীরা খুব তারিফ করেন কিন্তু নিজেরা তা পালন করে না। কারণ তাঁরা নিজেদের ভালোটা ভালরকমই বুঝতে পারে। বাঙালীরা নিজের ভালও বোঝে না। নিজের ভাল বুঝতে পারাটা নিশ্চয়ই কোন অপরাধ নয়।

বাঙালীর মানসিকতায় কিছু দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বেঁধে আছে। সে সব নির্মূল হওয়া দরকার। তা না হলে বাঙালীর পরমায়ু দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে। মনে রাখা দরকার; কেবল শিল্পকলার চর্চা করে, সঙ্গীত ও সাহিত্যের পরিচর্যা করে, নিজের বুদ্ধিবৃত্তির অহংকারে তুরীয় ভাব অবলম্বন করে থাকলে

ব্যক্তিবিশেষের স্থায়ীত্বলাভের পথ যতই প্রশস্ত হোক, জাতিগত দিক থেকে বেঁচেবর্তে থাকার কোন গ্যারান্টি নেই। তার জন্য দরকার জাতিগত ভাবে শ্রম ও শ্রমজনিত উপার্জনে সক্ষমতা। আর এ ক্ষেত্রে বাঙালীর একটা বড় প্রতিবন্ধকতা সেই মানসিক ব্যাধি। এক নয়, একাধিক।

এক নম্বর ব্যাধি, কাজ সম্পর্কে বাঙালীর কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। সেই জন্যই কাজের শ্রেণী বিচারে বাঙালীরা খুবই সচেতন। এবং স্পষ্টতই কোন কোন কাজ বাঙালীর উপযুক্ত, আর কোন কোন কাজ ওই ভিনদেশীদের অবশ্য করণীয়, সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট মতামত গড়ে তুলেছে। দেখা গিয়েছে, পরিশ্রমের কাজগুলিকে বাঙালী প্রথম থেকেই সযত্নে পরিহার করেছে। ওসব নাকি বাঙালীর উপযুক্ত কাজ নয়। বাঙালী কেবল ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনীয়ার অধ্যাপক, বড় জোর আপিসের বড়বাবু হবে। বাকি সবই ছোটলোকের কাজ, বাঙালীর কাজ নয়। একমাত্র বাঙালীই গর্ব করে বলে থাকে, ভিক্ষে করে খাব তবু ও কাজ করব না। কাজের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ না থাকাতেই এই বিচিত্র মানসিকতা, যা আসলে বাঙালীর পতনের অন্যতম কারণ।

দু' নম্বর ব্যাধি, বাঙালীর ভুয়া অহমিকা বোধ। বাঙালীর ধারণা, সে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। কেবল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সে একই ভারতের অন্য রাজ্যের অধিবাসীদের ন্যূনযোগ্যতাসম্পন্ন বলে মনে করে। এই ভাবনার মূলে আছে বাংলা ও বাঙালীর সংস্কৃতি সম্পর্কে এক ধরণের বিচিত্র চিন্তা। বুদ্ধির চর্চ্চায় ও সংস্কৃতির পরিচর্যায় বাঙালী ববাবরই অগ্রগণ্য। এই তথ্যটি সর্বদা সত্য নয়। ভারতীয় সমাজপটে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এটি সত্য ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু, এখন আর সে কথা বলা যায় না। এর অনেক প্রমাণ দেওয়া যায়। সাহিত্য শিল্পকলা বিজ্ঞানর্চ্চা, শরীরর্চ্চা ও চাকুরি সংক্রান্ত সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলিতে বাঙালীর স্থান বড় একটা বেশি নয়। কিন্তু, শতাব্দীকালের সেই শ্রেষ্ঠত্ব বোধের অহমিকাটুকু রয়ে গিয়েছে। বাঙালী আশুতোষ হতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে তোষামদপ্রিয়ও বটে। মহামতি

গোখলে হোয়াট বেঙ্গল থিংস্ টুডে, ইণ্ডিয়া থিংস্ টুমরো কথাটি আদৌ বলেছিলেন কিনা, তার কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু এই জয়নগরের মোয়াটি দেখিয়ে বাঙালীদের এখন পর্যন্ত দিব্যি শান্ত রাখা যায়। বাঙালীরাও জেনে শুনে কেবল তোষামোদে তৃপ্ত হতে এই আপ্তবাক্য ধ্রুবতারা করে অহংবোধকে আরও তাপিত রাখতে তৎপর। বাঙালীর অহংবোধ যদি এই পর্যন্ত এসেও থেমে থাকত, তাহলে অতটা ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না। এই ভূয়া অহমিকা ও আত্মমর্যাদাবোধ বাঙালীকে অন্যের প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলার শক্তিও জুগিয়েছে। শতাব্দীকাল ধরে বাঙালীরা ভারতের অন্য ভাষাভাষী বিশেষ করে নিকট প্রতিবেশীদের সম্পর্কে নীচু ধারনা পোষণ করে এসেছে। আজও এই ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি। স্বাধীনতার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই বোধ বাঙালীর পক্ষে ভয়ঙ্কর ক্ষতির কারণ হয়ে উঠেছে।

তিন নম্বর ব্যাধিটি হল, বাঙালী মূলত পরগাছা জীব হয়ে থাকতেই ভালবাসে। আত্মনির্ভরতার জন্য যে টুকু মেধার প্রয়োগ ও কায়িক পরিশ্রমের দরকার, বাঙালীর তাতে প্রবল অনীহা। তার চেয়ে বুদ্ধিটুকু সম্বল করে পরের উপর নির্ভর করে থাকাই শ্রেয়। এই বোধ থেকেই বাঙালীর মধ্যে চাকুরিজীবী হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, এই বোধ থেকেই পরের অনুকরণ করার প্রবৃত্তিও বলশালী হয়েছে। আজও এই ধারা অব্যাহত আছে।

দোষের কথা আর না বাড়িয়ে, রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এনে এই লেখা শেষ করছি। আমার নিশ্চিত ধারণা, গত পঞ্চাশ বছরে বাঙালীর মনকে পুষ্টি যুগিয়েছেন সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাঙালী রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত পুষ্টি অনেকটাই নিতে পেরেছে। সেই সঙ্গে জেনে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ চিত্তের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনের স্থূল প্রয়োজনের দিকটাতেও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেইজন্যে ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পে একইভাবে বাঙালী প্রতিভাকে উদ্যোগী হতে বারবার বলেছেন। স্বদেশী দেশলাই থেকে জীবন বীমা সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে যে বাড়ির লোকেদের

উদ্যোগে, সেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্রনাথ নিজে হাতেকলমে কৃষি ও শিল্পের বিকাশের প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন। শিলাইদহে সে আমলের জমিদার রবীন্দ্রনাথ সমবায় পদ্ধতিতে চাষ আবাদের পত্তন করেছিলেন, কৃষি ঋনদান সংস্থা গড়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুলেছেন গ্রামীণ শিল্পপীঠ শ্রীনিকেতন, পরিকল্পনা করেছেন পল্লীর উন্নয়নের। সমাজবদ্ধ মানুষের, এই বাঙালী মনুষ্যজাতির জন্য রবীন্দ্রনাথ জীবনের এই দিকটাতেও পুষ্টির আয়োজন কিছু করে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাঙালীরা তা নিতে পারে নি বা নিতে চায়নি। কারণ যাই হোক, ফল কিন্তু ভাল হয়নি।

গান্ধীবাদী রাজনৈতিক নেতা

১৯৪৭ সালে সারা ভারতে বেকারের সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ। আর এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৪০ লক্ষ। এক পশ্চিমবঙ্গেই ২১ লক্ষ ৯৯ হাজার। এটা হল সরকারী হিসাবের খাতা থেকে পাওয়া তথ্য। আসলে বেকারের সংখ্যা আরও বেশি। সংখ্যা যাই হোক, ওই একটি হিসাব থেকেই বোঝা যায় দিনের পর দিন, বছরের পর বছর বেকারের সংখ্যা কীভাবে বেড়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও কিছু বেশি। এখন তো শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এই রাজ্যেই সবচেয়ে বেশি। লোকসংখ্যা বাড়লেই বেকারের সংখ্যা বাড়বে, এমন কোন কথা নেই। কাজের সুযোগ যদি বাড়ানো যায়, তাহলে বেকারের সংখ্যা নাও বাড়তে পারে। স্বাধীনতার পর গত তেত্রিশ বছরে কাজের সুযোগও অনেক বেড়েছে। নতুন নতুন চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য বেড়েছে। চাষবাসে কাজের সুযোগ বেড়েছে। তা সত্বেও কিন্তু চাকরি না

পাওয়া, কাজ না পাওয়া লোকের সংখ্যাই দিন দিন বেড়ে চলেছে। কেন এমন হচ্ছে? এর কি কোন প্রতিকার নেই? কয়েক লক্ষ মানুষ জীবনভর বেকার থেকে যাবে? এই প্রশ্ন নিয়ে প্রথমেই হাজির হলাম প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাছে। আশি পেরোনো, প্রবীণ রাজনীতিবিদ, আরামবাগের গান্ধী প্রফুল্লচন্দ্র একসময় ছিলেন এই রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী, তারপর মুখ্যমন্ত্রী। সমাজসেবা থেকে রাজ্যশাসন—বহু বিচিত্র পথে তাঁর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। তাঁর মতে বেকার সমস্যার সমাধানের আপাতত দু'টি পথ: (১) গ্রামীণ শিল্পের ব্যপক প্রসার, (২) চাকরি করার মানসিকতা ছেড়ে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য উৎসাহী হওয়া।

প্রফুল্লবাবু বলেন, এ পর্যন্ত ৫টা পঞ্চবার্ষিক যোজনার মধ্যে তিনটির কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। এতে খরচ হয়েছে ১ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু ফল কী হয়েছে? এত পরিকল্পনার সুফল পেয়েছে মাত্র ২০ শতাংশ লোক। আর এখনও সরকারী হিসাব মতই শতকরা ৭০ জন লোক বাস করছে দারিদ্র্য-সীমার নীচে। এই সময়ের মধ্যে বড় বড় কলকারখানা হয়েছে। রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে। চাষবাসেরও উন্নতি হয়েছে। চাষবাসের ক্ষেত্রে তো রীতিমত একটা বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার আগে পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলির জন্য পাট আসত পূর্ববঙ্গ থেকে। স্বাধীনতার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। এখন পাটের চাহিদা মেটাতে এই রাজ্যের ১০ লক্ষ একর ধানী জমিকে পাটের জমিতে বদল করা হল। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ থেকে এল ৪২ লক্ষ উদ্বাস্তু। জমি কমলো, জনসংখ্যার চাপ বাড়ল। স্বাধীনতার সময় গোটা ভারতে লোক সংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি। এখন তা প্রায় ৬৭ কোটি। এসব সত্বেও কিন্তু সবুজ বিপ্লবের নিশানা ধরে ভারত এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ম্ভর। চাষবাসে এই অবস্থা, কল-কারখানায় দুর্গাপুর আসানসোল শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠল, ব্যারাকপুর বজবজ শিল্প এলাকাও সমৃদ্ধ হল, বড়বাজার ফুলে ফেঁপে উঠল। কিন্তু বেকার সমস্যা থেকেই গেল। স্বাধীনতার সময় পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত শিল্পে শ্রমিক-কর্মীর সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার। নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠায় কাজের সুযোগ

বাড়ল। ১৯৬৫ সালে সংগঠিত শিল্প শ্রমিক-কর্মীর সংখ্যা দাঁড়াল ৮ লক্ষ ৭০ হাজার। কিন্তু তারপর? বাড়ল না। বরং কমলো। এখন সংগঠিক শিল্পে শ্রমিক কর্মীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার। এদিকে বছর বছর বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজের সুযোগ বাড়ানোর কোন চেষ্টা নেই।

কাজেই, প্রফুল্লবাবু মনে করেন, এতকাল যেভাবে চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে বিশেষ ফল হয়নি। আরও বেশি লোককে কাজ দিতে হলে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে কোন পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। এই পরিকল্পনার মূল তাগিদ হওয়া চাই বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতি। অর্থাৎ এক জায়গায় জমাট বাঁধা বিনিয়োগ নয়, দেশের নানা অঞ্চলে অর্থনৈতিক পুষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে। এক কথায় গ্রামে গ্রামে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে ছড়িয়ে দেওয়া। একটি ইস্পাত কারখানা বানিয়ে যত লোককে চাকরি দেওয়া সম্ভব, সেই টাকায় কয়েক হাজার গ্রামীণ কুটির শিল্প গড়ে তুললে তিনগুণ লোকের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করা যায়। আমাদের দেশের গোড়ার দিককার পরিকল্পনায় এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়নি। পরে অবশ্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, সে কাজও খুব যত্নের সঙ্গে করা হয়নি। স্বাধীনতার সময় এই রাজ্যে ৪০ হাজার তাঁত ছিল। ১৯৬৫ সালের মধ্যে তা বেড়ে হল ১ লক্ষ ৬০ হাজার। ব্যস্, তারপর আর একখানা তাঁতও বাড়েনি। বরং নানা কারণে বেশ কিছু কমেছে। কাজের সুযোগ বাড়াতে হলে গান্ধীজীর গ্রামীণ অর্থনীতির আদর্শে বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চালু করে গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্প গড়ে তুলতেই হবে।

প্রফুল্লবাবু বলেন, বাঙালী যুবকদের মধ্যে প্রায় সকলেরই কোনরকমে একটা চাকরি জুটিয়ে নেওয়ার ঝোঁকই বেশি। এটা ছাড়তে হবে। একটা জাতের সবাই যদি চাকরি করতে চায়, তাহলে তার অন্যের চাকর হওয়া ছাড়া উপায় নেই। সবাই তো চাকুরিপ্রার্থী, চাকরিদাতা হবে কে? নিশ্চয়ই অন্য লোক। আমি যেখানে থাকি, তার কাছেই ক্যামাকস্ট্রীট। সেখানে যত দোকান, সব কয়টিই অবাঙালীর। ওই রাস্তাতেই যত মোটর গাড়ি দাড়িয়ে থাকে, তার

শতকরা ৯৫টিরই মালিক অবাঙালী। ৬৭ বছর আগে যখন প্রথম কলকাতায় আসি, তখন আমরা হগ মার্কেটে (নিউ মার্কেট) যেতুম। সেখানকার সব কয়টি দোকানই ছিল বাঙালীর। আর এখন? সব দোকানই বাঙালীর হাত ছাড়া। ১৯৫৯ সালের কথা। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় একবার ঠিক করলেন, কলকাতার পান বিড়ির দোকানগুলি কারা চালায়, কেমন আয় হয় সে সব দোকান থেকে, নিজের চোখে দেখবেন। বের হলেন। দেখলেন ১০০টি পান বিড়ির দোকান। তার মধ্যে ৯৩টিই অবাঙালীর।

ওরা যদি পারে, আমাদের ছেলেরাই বা পারবে না কেন? প্রফুল্লবাবু বলেন, পারে না তার প্রধান কারণ, আমাদের ছেলেদের চাকরি করার মোহ। ব্যবসা করার মানসিকতাই নেই। এটা বদলানো দরকার। অত চাকরি পাওয়া যাবে কোথা থেকে? চাকরি করার চেয়ে পান বিড়ির দোকান করা যে টাকার দিক থেকেই লাভজনক তাই নয়, তাতে মর্যাদাও অনেক বেশি।

মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক নেতা

মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত খুব স্পষ্ট এবং সরাসরি কথা বলতে ভালবাসেন। তাঁর রাজনৈতিক মতামতও কখনও অতিরিক্ত ব্যাখ্যার অপেক্ষা করে না। দেশের নানা ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর তাৎক্ষণিক মন্তব্য প্রায় ক্ষেত্রেই খুব ঋজু ও সুস্পষ্ট। বেকার সমস্যা সম্পর্কেও তাঁর প্রথম ও শেষ কথা, এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বেকার সমস্যা থাকবেই। সমাধান? রাজনৈতিক দিক থেকে করতে হবে। বেকার সমস্যা তো কোন বিচ্ছিন্ন

ঘটনা নয়। দেশের রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তন চাই আমরা। সে পরিবর্তন যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুতেই বেকার সমস্যার মত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

কেন এই ভয়াবহ বেকার সমস্যা? রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও প্রমোদবাবুর মতে, আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার মৌল বৈশিষ্ট্য হল কেবল মুনাফা অর্জনের সংগঠিত প্রয়াস। এর সঙ্গে মানুষের কল্যাণের প্রশ্নটি আদৌ জড়িত নয়। ফলে, স্বাধীনতার পর শিল্পের কিছু বিকাশ ঘটেছে, তার মানে বেশ কিছু নতুন নতুন কলকারখানা হয়েছে, কিছু লোকের চাকরিও হয়েছে। কিন্তু বেকারের সংখ্যা তাতে কমলো কি? দেশের অর্থনীতিই কি মজবুত হল? হল না। কেবলমাত্র মুনাফার দিকে লক্ষ্য থাকায় শিল্পপতিরা এমনভাবে শিল্প পরিচালনা করেছে যাতে শ্রমিকরা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং লাভের কড়িও জাতীয় অর্থনীতি প্রবাহে বড় একটা সামিল না হয়ে নিজেদের ভাণ্ডার বাড়িয়ে তুলেছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। ভারতে ঠিক সেইরকমই হয়ে এসেছে। এখনও চলছে।

প্রমোদবাবু বলেন, অথচ উৎপাদন ব্যবস্থাকে জনকল্যাণমুখী করলে বেকার থাকে না। শিল্পের বিকাশ জাতীয় অর্থনীতিকেই পুষ্টি যোগায়। জন-কল্যাণমুখী বলতে বোঝায় মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। মানুষের প্রয়োজন বলতে বোঝায় একদিকে মানুষের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য, অন্যদিকে কত বেশী মানুষকে এই উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে পারা যায়। এই রকম জনকল্যাণমুখী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে চীনে, কোরিয়ায়। তাই সেখানে বেকার বলে কোন শ্রেণী নেই, বেকার সমস্যা বলে কোন সমস্যা নেই। শিল্পে যেমন, কৃষিতেও একই দৃষ্টিভঙ্গী থাকা উচিত। আমাদের দেশের কৃষিক্ষেত্রেও উৎপাদন যত বাড়ল, সমস্যাও তত তীব্র হল, কেবল ওই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবেই। আমাদের দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন। কিন্তু মানুষের কল্যাণের

জন্য জমি বণ্টন, ভূমি সংস্কার, আবাদী কানুন কিছুই করা হয়নি। ফলে, কৃষি উৎপাদনের সুফল মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর হাতেই গিয়ে পড়েছে। বৃহত্তর জনসাধারণ তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এইভাবে দেশের বেশির ভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়েনি। ক্রয়ক্ষমতা তেমন বাড়েনি বলে আভ্যন্তরীন বাজারও বড় হয়ে উঠেনি। আর সেটা হয়নি বলে শিল্পের উৎপাদন একটা জায়গায় এসে ঠেকে আছে। আর বাড়ানোর উপায় নেই। এবং এখন যে সব উৎপাদন হচ্ছে, তার লক্ষ্য গিয়ে দাঁড়াচ্ছে রফতানি করার দিকে। এতে দেশের মানুষের বৃহত্তর অংশের কল্যান সম্ভব নয়।

প্রশ্ন রেখেছিলাম, জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি কি আমাদের দেশে ভয়াবহ বেকার সমস্যার কারণ নয় ?

উত্তরে প্রমোদবাবু বললেন. একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু বড় কারণ নিশ্চয়ই নয়। চীনে তো লোক সংখ্যা আমাদের থেকে অনেক বেশি। আমাদের দেশে এখন লোকসংখ্যা ৭০ কোটি। চীনে ১০০ কোটি। আমাদের দেশে সরকারী বেসরকারী হিসাব মিলিয়ে প্রায় ৬ কোটি লোক বেকার। অথচ চীনে বেকার নেই। কেন নেই ? জনসংখ্যা যদি মূল কারণ হতো, তাহ'লে তো চীনেই সব থেকে বেশি বেকারের সন্ধান পাওয়া যেত। আসল কথা, কোন ধরনের অর্থনীতি চলছে, তার উপর নির্ভর করে বেকার থাকবে কি থাকবে না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বেকার নেই, পুঁজিবাদী দেশে আছে। কারণ, দুই দেশে দু'রকম অর্থনীতি চালু।

প্রশ্ন করি, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার যে সব ব্যবস্থা নিয়েছেন, যেমন বেকার ভাতা ইত্যাদি, তার দ্বারা কি এই সমস্যার সমাধান আংশিক অথবা পুরোপুরি সম্ভব ?

প্রমোদবাবু বলেন, এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একটি রাজ্য সরকারের পক্ষে বেকার সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য কিছুই করা সম্ভব নয়। যাই করতে যাওয়া

হোক না কেন, কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয়। কেন্দ্রে যে সরকার আছে, তার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য অনেক। বেকার ভাতা দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হয় না। একটা কিছু যা হোক করা হলো, এইরকম ভাবনা থেকেই এই ব্যবস্থা। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কিছু উন্নতি করা যায়। বামফ্রন্ট সরকার গত তিন বছরে তা যথেষ্ট করেছেন। এতে বহু লোকের কর্মসংস্থানও হয়েছে। কিন্তু দেশের গোটা সমস্যাটার তুলনায় এসব অতি সামান্য। এই করে এই সমস্যার সমাধান হয় না।

তাহলে? প্রমোদবাবুর স্পষ্ট জবাব, রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই। আমরা যে রাজনীতিতে বিশ্বাসী, তাতে জনকল্যাণমুখী উৎপাদন ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে। সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থা কিছুতেই করা যাবে না।

শিল্পপতি

সরকার না চাইলে বেসরকারী শিল্পেরও প্রসার ঘটে না। শিল্প না বাড়লে কাজের সুযোগও বাড়ে না তাই নয়, ব্যবসা বাণিজ্যও বাড়তে পারে না বলে নানারকম বৃত্তির লোকেরও কাজের সুযোগ বাড়ে না। বাঙালী শিল্পপতিদের অন্যতম অমিতাভ পালচৌধুরী বেকার সমস্যা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার কারণ বলতে গিয়ে ওইভাবে শুরু করেছিলেন। তিনি যেহেতু একজন শিল্পপতি, সুতরাং তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করেছেন।

অমিতাভবাবুর হাতে আছে তিনটি চা বাগান, তিনটি ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প কারখানা। আছে একটি হেড অফিস। সব মিলিয়ে কর্মচারীর সংখ্যা তিন হাজারের কিছু বেশি। প্রতি বছরই কর্মচারীদের অনেকে অবসর নেন। কেউ কেউ চাকরি ছেড়েও দেন। এই সব কারণে বছরে গড়ে ৪০০ লোকের নতুন চাকরি হয় এই সব প্রতিষ্ঠানে। কী ভাবে লোক বাছাই করেন? উত্তরে অমিতাভবাবু বলেন, সাধারণত আমরা অদক্ষ শ্রমিক নিই। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কাছেই প্রথমে হাত পাতি। বেশির ভাগ নিয়োগ ওই ভাবেই হয়। আবার কখনও কখনও সরাসরি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক নিয়োগ করে থাকি।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলে রাখি। এটা বিশেষ করে প্রতিবেদকের কথা—চা বাগানে চাকরি পেলে নির্দ্বিধায় নিয়ে নেবেন। সম্প্রতি আমি চা বাগান ঘুরে এসেছি। চা বাগানগুলি আর আগের মত নেই। মাইনে ভাল, জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধা আগের থেকে ঢের বেড়েছে। যাতায়াতের ব্যবস্থা তো অসম্ভব ভাল হয়েছে। চা বাগানের চাকরি এখন অন্য অনেক শিল্পের তুলনায় ভাল।

অমিতাভবাবু বললেন, বেসরকারী শিল্পপতিরা কেউ পকেটের পয়সা ঢেলে দেশের লোকের উপকার করতে বসেননি। তাঁরা নিশ্চয়ই দেশের লাভের সঙ্গে নিজের লাভটাও দেখবেন। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কেউ শিল্প গড়তে বা বাড়াতে পারেন না। তার জন্য সরকারের দ্বারস্থ হতে হয়। অর্থাৎ সরকারকে এমন কিছু সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিল্পপতিরা নতুন শিল্প গড়তে বা চালু শিল্প বাড়াতে উৎসাহী হন। দুর্ভাগ্যের বিষয় গত তেত্রিশ বছর ধরে অনেক বড় বড় কারখানা হয়েছে কিন্তু এইরকম একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে শিল্প এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে। বাড়ছে না। বাড়ছে না বলে কাজের সুযোগও বাড়ছে না। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি যতদিন না বদলাচ্ছে, ততদিন বেকার সমস্যার সত্যিকারের কোন সমাধান হবে না।

আরও একটা কথা। যে দলই সরকারে আসুন, তাঁর আশু লক্ষ্যটা কী? আমরা এত বছর ধরে যা দেখলাম তা হল, আশু লক্ষ্য কিছু পাইয়ে টাইয়ে দিয়ে ভোটের হিসাবটা ঠিক রাখা। দেশের স্বার্থ কেবল কথার কথা। এই দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হওয়া দরকার। এই হিসাব ঠিক রাখতে গিয়ে সরকার কখনই পয়সাওয়ালা শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না। তাতে হিসাব ঠিক থাকে, কিন্তু কোটি কোটি বেকারের জন্য সত্যিকারের কিছু করা আর হয়ে ওঠে না। কবে এর পরিবর্তন হবে?

শ্রমিক নেতা

ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে মহম্মদ ইলিয়াস একটি পরিচিত নাম। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। মূল কর্মক্ষেত্র পশ্চিমবাংলার ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প। স্বাধীনতার আগের যুগের শিল্প শ্রমিক ও কর্মসংস্থানের অবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। স্বাধীনতার পর গত তেত্রিশ বছর ধরে দেখে আসছেন ওই অবস্থারই আর এক রূপ। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থাকলেও, ইলিয়াস সাহেবের বেকার সমস্যা সম্পর্কে মতামত খুবই মূল্যবান।

ইলিয়াস সাহেবের স্পষ্ট মত, আমাদের দেশে যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে তাতে বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় কিছুতেই। এতে বেকার সমস্যা বাড়বেই। হচ্ছেও তাই। অর্থাৎ মূল গলদটা থেকে যাচ্ছে পরিকল্পনার মধ্যে। এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর, যাবতীয় সম্পদ নিজেদের

হাতে পাওয়া সত্ত্বেও এমন কোন পরিকল্পনা রচিত হয়নি যার ফলে সুসম শিল্পের বিকাশ হতে পারে। এবং বিকাশ বা সম্প্রসারণ যতটা সম্ভব তা অনায়াসেই হতে পারে। এসব যদি হত, তাহলে কাজের সুযোগ ক্রমাগতই বাড়ত। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না।

ইলিয়াস সাহেব মনে করেন, সরকার ও শিল্পপতিরা বরাবরই তাঁদের মতো করে ব্যাপারটা দেখেছেন। দেশের মানুষের দিকে তাকিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। শ্রমিকরা যাদুকর। এই শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখলে উৎপাদনে ভেলকি দেখানো যায়। কিন্তু মালিকরা সে রাস্তায় যাননি। শ্রমিক মালিক বিরোধে সরকার পক্ষপাতশূন্য থাকেননি। বিরোধে সুযোগ নিয়ে মালিকরা নিজেদের মতলব হাসিল করেছেন। শিল্পের প্রসার বন্ধ রেখেছেন। নতুন নতুন কাজের সুযোগ আটকে দিয়েছেন। এসব করা হয়েছে সব জেনে শুনে। শিল্পে কোন শাসন নেই। অরাজকতা অব্যাহত।

রাতারাতি এই সমাজ ব্যবস্থার বদল হচ্ছে না। আপনারাও চেষ্টা করে পারেন নি। এটা মেনে নিয়েই, কী করলে কোন ব্যবস্থা নিলে এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার একেবারে না হোক, কিছুটা সমাধান হতে পারে? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে ইলিয়াস সাহেব বলেন, গ্রামকে শহরে পাঠানো বন্ধ করতে হবে। প্রতি বছর হাজার হাজার ছেলে চাকরির খোঁজে কলকাতায় এসে ভিড় করে। যেন, কলকাতায় গেলে একটা হিল্লে হবেই। হয় না কিন্তু। মাঝখান থেকে হতাশা বাড়ে। আসলে গ্রামগুলিতেই শিল্প গড়ে তুলতে হবে। এবং এটাই একটা বড় রাস্তা। গ্রামের মানুষদের দিয়ে বড় শিল্প বা মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা যাবে না। উচিতও নয়। গড়তে হবে ছোট মাপের বা কুটির শিল্প। এ ক্ষেত্রে বেছে নেওয়া উচিত প্রাচীন শিল্পগুলিকে। বংশপরম্পরা অভিজ্ঞতার সঙ্গে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী যুক্ত হলে খুব সহজেই এই সব শিল্প প্রসারলাভ করবে। বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। মোরাদাবাদের মুঘলকী শিল্প এখন বিশ্ব জোড়া আসন পেতেছে। কোটি কোটি টাকার

বৈদেশিক মুদ্রা আনছে। তেমনি পশ্চিমবঙ্গেও তো এ রকম অনেক গ্রামীণ ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্প আছে। গ্রামে গ্রামে সেগুলোর পুনরুজ্জীবন ঘটানো যেতে পারে।

অবশ্য সরকার ও সরকারী কোন সংস্থাকে এ ব্যাপারে বড় ভূমিকা নিতে হবে। কাঁচামালের যোগান ও উৎপাদিত পণ্য কিনে দেওয়ার ব্যাপারে সরকারকে গ্যারান্টি দিতে হবে। সমবায় করে তাঁত শিল্পে এই রকম চেষ্টা কিছু করা হয়েছে। অন্যান্য শিল্পেও হতে পারে। মাছের তো দারুণ চাহিদা। সমবায় করে হাজার হাজার পুকুর সংস্কার করে চাষ করা যায় না? তাতেও বহু লোকের কাজ জুটতে পারে। এইভাবে খুঁজে দেখলে আরও পথের সন্ধান পাওয়া যাবে।

শ্রমমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ মনে করেন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর দিকে লক্ষ্য রেখে কোন পরিকল্পনা এ যাবৎ তৈরী হয়নি। বেকার সমস্যা যে হারে বাড়ছে, তার সমাধানের জন্য প্রয়োজন ছিল আরও বড় মাপের আয়োজন করার। সেটা হয়নি। পাঁচ পাঁচটি পরিকল্পনা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। নতুন নতুন কারখানা হয়েছে। রাস্তা ঘাটও হয়েছে। বহু ইস্কুল কলেজ হয়েছে। এর ফলে বহু কাজের সুযোগ বেড়েছে। এখন আগের থেকে বেশি সংখ্যক লোক চাকরি করছে, ব্যবসা করছে, স্কুলে কলেজে পড়াচ্ছে। ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যাও বেড়েছে। তা সত্ত্বেও বেকারের

সংখ্যা বছর বছর বেড়েই চলেছে কেন? এর কারণ, এই সময়ের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ যে হারে বেড়েছে, মানুষের উৎপাদন বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। এই দুইয়ের মধ্যে যে ফাঁক, তা কমিয়ে আনার চেষ্টা হয়নি। বরং বেড়েছে। কমানো যায়নি, তার কারণ বিভিন্ন পরিকল্পনায় কিছু কিছু কাজের সুযোগ বাড়লেও, কাজের সুযোগ বাড়ানোর জন্যই বিশেষভাবে কোন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়নি। করলে, বেকার সমস্যা আজ এমন ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারত না।

কৃষ্ণপদবাবু বেকার সনস্যার সমাধানের পথে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও দায়ী করেছেন। বলেছেন, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে না পারলে কৃষি ও শিল্পের সহজ বিকাশ সম্ভব নয়। আর সেটা করতে না পারলে কাজের সুযোগ সৃষ্টিও সম্ভব নয়। দেশের লোক চিনি খেতে পাচ্ছে না, কিন্তু দেশে তৈরি সেই চিনিই রফতানি হচ্ছে। আবার পাট উৎপাদন হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। গুদামে পচছে। কিন্তু তা রফতানি করা হয় না। চেষ্টাও নেই। পাটচাষী দাম না পেয়ে মার খাচ্ছে। এই রকম আরও উদাহরণ দেওয়া যায়।

বেকারদের জন্য চাকরির সুযোগ বাড়নোর পথ দুটি—এক, শিল্প। দুই, কৃষি। শিল্পে একটা জায়গায় এসে আমরা থমকে দাঁড়িয়েছি। বড় সাইজের শিল্প আর হচ্ছে না। মাঝারি শিল্পের সংখ্যাও খুব কম। যা কিছু হচ্ছে ওই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। বড় ও মাঝারি শিল্প গড়তে হলে কেন্দ্রের অনুমোদন লাগে। শিল্প গড়ায় রাজ্য সরকারের বিশেষ ভূমিকা নেই। হলদিয়ায় জাহাজ মেরামতি কারখানা হলে বেশ কিছু লোকের চাকরি হতে পারে। সেও আজ হচ্ছে কাল হচ্ছে বলে আজও হয়ে ওঠেনি। এই তো শিল্পের অবস্থা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কিছু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এই সরকারের আমলে। কৃষ্ণপদবাবুর মতে নদি নালায় দিশি নৌকোর বদলে যদি ব্যাপকভাবে লঞ্চ সার্ভিস, কেবল পারাপারের জন্য নয়, মাল পরিবহনের জন্য চালু

করা যায় তাহলে অনেক উপকার হয়। প্রথমত, লঞ্চ সার্ভিস চালাতে বহু লোকের চাকরি হবে। দ্বিতীয়ত, জলপথে উন্নততর পরিবহন ব্যবস্থা হলে শিল্পেরও প্রসার হবে। নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠবে। চাকরির সুযোগ বাড়বে, ছোটখাটো ব্যবসার সুযোগ বাড়বে।

কৃষ্ণপদবাবু বলেন, কাজের সুযোগ বাড়াতে আরও কিছু করা যেতে পারে। বেশ কিছু কলকারখানা বন্ধ হয়ে আছে। রুগ্ন হয়ে পড়েছে। এগুলি সরকার অধিগ্রহণ করতে পারেন। কয়েকটি করেছেন। আরও করা দরকার। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় কিছু কাজের সুযোগ বেড়েছে। নতুন নতুন পৌরসভা গড়ে তোলা হচ্ছে, তাতে কিছু কাজ মিলবে। হাসপাতাল বাড়ানো হচ্ছে। সেখানেও অনেকে কাজ পাবে। দু'হাজার নতুন প্রাইমারি স্কুল হয়েছে। কাজ মিলেছে কয়েক হাজার যুবকের। এ ছাড়া, আরও একটি কাজ করতে পারে বেসরকারি সংস্থাগুলি। প্রত্যেক সংস্থায় এক বা একাধিক ট্রেনিং ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। তাহলে বহু ছেলে ট্রেনিং পাবে। তাদের কাজের সুযোগ বাড়বে। সংস্থাগুলিও গোড়া থেকেই দক্ষ কর্মী পাবে। এটা করা উচিত। আর একটা কথা, কম্পিউটারের মত আধুনিক যন্ত্রপাতি বসিয়ে বেকার ভারাক্রান্ত এই দেশে কাজের সুযোগ ছেঁটে ফেলা অনুচিত। অন্যায়।

এরপর আসছে কৃষির কথা। সত্যি কথা বলতে কি, কৃষ্ণপদবাবু বলেন, কৃষিকাজেই কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর সুযোগ সবচেয়ে বেশি। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে গোড়াতেই রয়েছে মস্ত গলদ। অর্থাৎ জমির সুসম বণ্টন করা হয়নি, প্রয়োজনমত জমি যদি ঠিকভাবে বণ্টন করা হয়, তাহলে অনেক বেশি চাষীবাসী মানুষ নিজের জন্য জমি পাবে। সেই জন্যই বর্গা অপারেশন। নিজের জমি হলে চাষীর উৎপাদন বাড়ানোর দিকে মন যাবে। সরকার যদি সময়মত বীজ সার যোগাতে পারেন, তাহলে উৎপাদন বাড়বে। কিন্তু, উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার ব্যাপারেও চাষীকে সুনিশ্চিত করতে হবে। তার জন্য সরকারকেই ফসল কেনার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। এইভাবে জমির সুসম

বণ্টন ব্যবস্থায় চাষীর সংখ্যা বাড়বে, উন্নত মানের চাষ করে উৎপাদন বাড়বে এবং বীজ সার কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদির সুত্রে আরও কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়ে যাবে। রাজ্য সরকার এদিকে লক্ষ্য রেখে এগোচ্ছেন। কিন্তু এখনও অনেক কিছু করার বাকি আছে।

আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণপদবাবু যা বললেন, তার সারমর্ম হচ্ছে: শিল্প গড়তে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বোম্বাই আর্থিক সুবিধা বেশি পেয়ে থাকে। বেকারভাতা দেওয়ার সময় একটা শর্ত ছিল, ভাতাপ্রাপকদের সপ্তাহে দু'দিন কাজ করানো হবে সরকারি সংস্থায়। সেই শর্ত ঠিকঠাক পালন করা হয়নি, কারণ ওঁদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা যায়নি। দু'চারটি জায়গায় অবশ্য ভাতাপ্রাপকদের কিছু কিছু কাজ দেওয়া হচ্ছে। সে সামান্যই। কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম লেখালে চাকরি মেলে না, এই অভিযোগ ঠিক নয়। এখন অনেকে চাকরি পাচ্ছে। তবে এটা ঠিক, ওই কেন্দ্রটি যে দুর্নীতিমুক্ত এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-গুলিরও উচিত কর্মসংস্থান মারফৎ লোক নেওয়া।

অর্থমন্ত্রী

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ও অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোক মিত্র মনে করেন, বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বেকার সমস্যা থাকবেই। যাঁরা বেকার তাঁদের কোন দোষ নেই, দোষ সেই শাসক গোষ্ঠির যাঁরা এঁদের বেকার বানিয়ে রেখেছেন। রাজ্য সরকারের হাতে প্রায় কোন ক্ষমতাই নেই। তবু, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি বা না পারি আমরা প্রায় তিন লক্ষ বেকারকে বেকার ভাতা দিচ্ছি।

এটাও কিন্তু অভাবিত কিছু নয়। সংবিধানের ৪১ নং ধারায় ভারতীয় নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার বিধি আছে। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন তাদের দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে, এমন কথাও লেখা আছে। কাজেই, বেকারদের জন্য যে দায়িত্ব ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার তা করেননি। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সরকার তার কিছুটা করলেন। আমরা পথ দেখালাম। অন্যরা সেই পথ দেখে চলুন।

কেন এত ভয়াবহ বেকার সমস্যা? এর উত্তরে অশোকবাবু বললেন, এটা কোন বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। আলাদা করে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নয়। এই সমস্যার উৎসে আছে তীব্র আর্থিক সঙ্কট, যে আর্থিক সঙ্কট আমাদের দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণাম। কাজেই, যে রাষ্ট্রশক্তি আমাদের দেশে শাসন ক্ষমতায় আছে, তাতে মুষ্টিমেয় লোকের শোষণ চালিয়ে যাওয়াটাই আসল কথা। এবং সেটাই সত্য। এই অবস্থায় অগণিত মানুষের আর্থিক অগ্রগতি নিশ্চয়ই তাদের কাম্য হতে পারে না। হয়ওনি। আর সেইজন্য দেশের বেশির ভাগ মানুষ—কৃষিজীবী শ্রেণী আজও পিছিয়ে পড়ে আছে। চাষযোগ্য জমির দুই-তৃতীয়াংশ আজও শতকরা দশ ভাগ লোকের কুক্ষিগত হয়ে আছে। অন্যদিকে শোষণের সরণি বেয়ে একচেটিয়া পুঁজি বেড়ে যাচ্ছে। এই বেশির ভাগ মানুষের উপার্জনের সুযোগ কমে আসছে। বেশিরভাগ লোকের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি না পাওয়ায় শিল্পের প্রসারও একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। সেখানেও কাজের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। আভ্যন্তরীণ বাজার গড়ে উঠছে না। নতুন করে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাওয়ায় স্বভাবতই বেকার সমস্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে।

এই অবস্থায় একটা রাজ্য সরকার কতদূর কী করতে পারেন? এর উত্তরে অশোকবাবু প্রথমেই বললেন, রাজ্য সরকারের ক্ষমতা খুবই সীমিত। পশ্চিমবঙ্গের কথাই যদি ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে স্বাধীনতার পর এই রাজ্যে বড় শিল্প খুব একটা হয়নি। অন্তত যতটা হওয়া উচিত ছিল, ততটা হয়নি।

গত ১৫ বছরে এক মেট্রো রেল ছাড়া আর কোন বড় উদ্যোগের কথা মনে করতে পারছি না। উপরন্তু, যে ক'টি বড় শিল্পের প্রস্তাব আমরা দিয়েছি, তা নানারকম টালবাহানা করে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে।

অশোকবাবু বললেন, হাত পা বাঁধা অবস্থার মধ্যে থেকেও বামফ্রন্ট সরকার, যে হেতু অন্যরকম একটি সরকার, এই রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর কিছু চেষ্টা করেছেন। গ্রামের শতকরা ৮০ থেকে শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের উপার্জন বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। ভূমিবণ্টন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে বর্গা অপারেশনের মাধ্যমে। ক্ষেত মজুরদের ন্যূনতম মজুরি চালু করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচীর দ্বারা কয়েক লক্ষ গরিব মানুষকে খাদ্য ও অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সরকারী ব্যবস্থায় শস্যবীজ, কীটনাশক ওষুধ, সার ইত্যাদি আরও বেশি সংখ্যায় গরিব চাষীর হাতে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারী ঋণের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে যে সব ঋণ পাওয়া যায়, তা যাতে বেশি সংখ্যক গরিব মানুষের হাতে গিয়ে পড়ে, তার ব্যবস্থা হয়েছে। বাজেটের একটা বড় অংশ এখন গ্রামের মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে রাজ্যের বাজেট বরাদ্দ যেখানে ছিল ৭৫০ কোটি টাকা, সেখানে ১৯৮০-৮১ সালে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৫৫০ কোটি টাকা। এই যে ৮০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেল, তার মধ্যে ৫০০ কোটি টাকাই বরাদ্দ হয়েছে গ্রামের গরিব মানুষের জন্য। এই সব প্রয়াসের ফলে গ্রামের বেশির ভাগ মানুষের এখন আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বহু লোক নতুন করে কাজের সুযোগ পাচ্ছে। তাদের ক্রয় ক্ষমতা আগের থেকে বেড়েছে।

এবার শহরের কথা ধরা যাক। শহরে কাজের সুযোগ বাড়াতে হলে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে হয়। সেটা নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের কতকগুলি বিনীত নিবেদন আছে: (১) অর্থলগ্নী সংস্থাগুলিকে বলুন পশ্চিমবঙ্গে আরও অর্থ বিনিয়োগ

করতে ; (২) কিম্বা, কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই এই রাজ্যে শিল্পে আরও টাকা বিনিয়োগ করুন ; (২) অথবা, কেন্দ্রীয় সরকার কিছু টাকা দিন রাজ্য সরকারকে, যাতে আমরা নিজেরাই এই রাজ্যে নতুন নতুন শিল্প গড়তে পারি। যদি এর একটাও কার্যকর হয়, তাহলে এই রাজ্যে শহরাঞ্চলের মানুষের জন্য কাজের সুযোগ বাড়ানো যাবে।

আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে অশোকবাবু বলেন, রাজ্যের কর্মসংস্থান কেন্দ্রে দুর্নীতি থাকতে পারে। আমাদের স্বীকার করা ভাল, রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা দীর্ঘদিনের অভ্যাসে বেশ ঢিলেঢালা। তাতে সব কাজ সময় মত ও ঠিক মত করা যায় না। কর্মসংস্থানের ব্যাপারটা দেখার জন্য আমরা জেলা পর্যায়ে একটা করে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছি। মাঝে মাঝে খবর পাই, ওই কমিটির কাজও সন্তোষজনক নয়।

সমাজসেবী

বেকার সমস্যা দিনের পর দিন এত তীব্র হচ্ছে কেন ? উত্তরে ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু বলেন, এর উত্তর খুব সোজা। দিনের পর দিন দেশের সম্পদ বাড়ছে। আবার দিনের পর দিন লোক সংখ্যাও বাড়ছে। আসল সমস্যাটা হল, সম্পদ বৃদ্ধির হারের চাইতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। ফলে, অঙ্ক মিলছে না। ফারাক বেড়েই চলেছে। বছর বছর কয়েক লক্ষ লোকের চাকরি হওয়া সত্ত্বেও বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু রাজনীতিতে সুপরিচিত নাম। গান্ধীবাদী রাজনীতিই করেছেন আজীবন—যদিচ পরবর্তীকালের গান্ধীবাদীদের অনেকের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয়নি। বিধানসভার সদস্য ছিলেন। লোকসভার সদস্য ছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনে মৈত্রেয়ী দেবীর প্রতিষ্ঠাও বহুদিনের। দূর চা বাগান থেকে শুরু করে ভাগীরথী তীরে চটকল, আবার ডক শ্রমিক মহল্লা—সর্বত্রই তিনি কাজ করেছেন। জীবন শুরু করেছিলেন সমাজসেবা দিয়ে, জীবনের প্রান্তে এসে আবার সমাজসেবাকেই করেছেন মূল কাজ। কয়েকটি অনাথ শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র পরিচালনা করছেন। মৈত্রেয়ী দেবী একজন লেখিকাও।

মৈত্রেয়ী দেবী বললেন, গত তেত্রিশ বছরে জাতীয় আয় বেড়েছে। তথ্য হিসাবে কোন গোলমাল নেই। আসল গোলমাল হল, আয়ের প্রায় সবটাই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে গিয়ে পড়েছে। দেশের সম্পদ কয়েকজনের হাতের মুঠোয় চলে যাওয়ায় দেশের কুটির শিল্পের বিকাশ হয়নি। দেশের সরকার ও মুষ্টিমেয় ধনশালীদের সঙ্গেও রয়েছে সুসম্পর্ক। ফলে দেশের সাধারণ মানুষের মুখ চেয়ে কোন পরিকল্পনা হয়নি। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে শিল্পপতিরা ক্রমাগত আধুনিক যন্ত্রপাতি এনে বসাতে লাগল। এর ফলে কয়লাখনিতে ৮ হাজার লোকের কাজ ৮০০ লোক দিয়ে করানো সম্ভব হচ্ছে। চটকলে নতুন যন্ত্রপাতিতে একটা লোক একসঙ্গে চারটে মেশিন অনায়াসে চালাতে পারে। তার উপর অটো-মেশিন তো একেবারে কালাপাহাড়ি। যে দেশে কাজের সংস্থানের চেয়ে কর্মপ্রার্থী মানুষের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি সেখানে এই ধরনের আধুনিকী-করণ উচিত নয়। সরকারের উচিত ছিল, এই দিকটা দেখার। দেখা হয়নি। মাঝখান থেকে নতুন কাজের সংস্থান যতটা বাড়ছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় কম, অন্যদিকে আবার আধুনিকীকরণের যাঁতাকলে কাজের সংস্থানের যতটা সুযোগ ছিল, তাও ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে।

বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য কী করা যেতে পারে। এর উত্তরে মৈত্রেয়ীদেবী বলেন, অনেক কিছুই করা যেতে পারে। তবে সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া উচিত গ্রামগুলির প্রতি। গ্রামে গ্রামে যেমন চাষ হয়, তেমনি ঠিক সেইরকম গুরুত্ব দিয়ে প্রতি গ্রামে অন্তত একটি করে শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা উচিত। সবগুলিই যে দেশী গ্রামীণ শিল্প হবে, তা নয়। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ও বণিকসভাগুলি মিলে মিশে বৃহৎ কল কারখানায় অনেক ছোট ছোট কাজ গ্রামের মানুষদের দিয়ে করিয়ে নিতে পারে। তাতে গ্রামের মানুষদের কাজে লাগানো হবে। চাষের উন্নতি সত্বেও গ্রামেই এখনও গরিব ও বেকারের সংখ্যা বেশি।

বিচারপতি

জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে না পারাই বেকার সমস্যার প্রধান কারণ। এই ধারনা কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্রের। তিনি বলেন, বেকার সমস্যা আজ কোন একটি দু'টি দেশের সমস্যা নয়। এ সমস্যা বিশ্বজোড়া। সবদেশেই এই সমস্যার মূলে আছে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। আমি দু'টো উদাহরণ দিচ্ছি।

১৯৫৪ সালে চীনে গিয়েছিলাম। ওখানে অনেক বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। -তখন ওঁরা আমাকে বললেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে আমরা ভয় করি না। আমাদের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা এমনই মজবুত করে ফেলেছি আমরা যে,

এটা আর কোন সমস্যাই নয়। এই শুনে তো চলে এলাম। কিন্তু, মজা হল এর তিন বছরের মধ্যেই চীনে পরিবার পরিকল্পনা চালু করতে হল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে। আমেরিকায় গিয়েছিলাম ১৯৫৮ সালে। সেখানে গিয়ে দেখি পরিবার পরিকল্পনা চলছে জোর কদমে। ব্যাপক প্রচার। লোকেও নিচ্ছে আগ্রহের সঙ্গে। সেখানে একদল সমাজসেবী, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিকের সঙ্গে একাধিকবার কথাবার্ত্তা হয়েছে। তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তোমাদের দেশ তো বেশ ধনী। হঠাৎ করে দরিদ্র হয়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই। তাহলে এত ঘটা করে পরিবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে কেন? উত্তর সকলেরই এক। ওঁরা বললেন, এখন থেকেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে একদিন তা সমস্যা হয়ে উঠবে। তখন হিসাবের খাতায় অঙ্ক মেলানো যাবে না। তখন আমাদেরও তোমাদের এখানকার মতো দারিদ্র্যের মুখে পড়তে হবে।

মিত্র মহাশয় বললেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে ধনবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুই দেশেই জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি একটা মস্ত বড় সমস্যা। এই সমস্যা থেকেই উদ্গত হয়েছে বেকার সমস্যা। ভারতের বেলাতেও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। বরং ভারতে এই ব্যাপারটা ঘটেছে আরও তীব্রভাবে। আমাদের দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য গত তেত্রিশ বছরে হয়ত অনেক টাকা খরচ হয়েছে, কাজের কাজ তেমন কিছু হয়নি। পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে ঘোরতর রাজনীতিও হয়েছে কিন্তু এই পরিকল্পনার আসল যে উদ্দেশ্য তা তেমন সফল হয়নি। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের যত লোকসংখ্যা, ভারতে ফি বছর তত লোকসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে শিল্প কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। সেটা প্রায় সবটাই ভারী শিল্প। এটারও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার সে দেশে গোটা কয়েক ভারী শিল্প করে বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না। ভারী শিল্প মানেই আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও অত্যাধুনিক যন্ত্রনির্ভরতা। এর

ফলে মানুষের প্রয়োজন হয় কম। একটা ভারী শিল্প পত্তনের জন্য যত টাকা লাগে, তা দিয়ে অন্তত এক হাজারটা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তোলা যায়। এই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি প্রধানত মানুষ-নির্ভর। এখানে মানুষের কার্য সংস্থানের সুযোগও বেশি। কাজেই অধিক সংখ্যক মানুষের কাজের জন্য প্রয়োজন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের। ভারী শিল্পের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একই সময়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলিকে পরিকল্পনা মাফিক গড়ে তোলা উচিত ছিল। কিন্তু সে রকম সুসংহত ও সামগ্রিক প্রয়াস গত তেত্রিশ বছরে লক্ষ্য করা যায়নি। ভারী শিল্পের জন্য যতটা করা হয়েছে, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য প্রায় কিছুই করা হয়নি। কাজেই ভারী শিল্পে মুষ্টিমেয় মানুষের কর্মসংস্থান হলেও বেশির ভাগ মানুষই কর্ম জোটাতে পারেনি।

মিত্র মহাশয় মনে করেন, বামফ্রন্ট সরকারের বেকারভাতা পরিকল্পনার অর্থ কর্মক্ষম বেকার ছেলেমেয়েদের ভিক্ষুকে পরিণত করা। ভাতা না দিয়ে এদের হাতের কাজ শিখিয়ে কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে না কেন? এই কলকাতা শহরেই ডাকলেই মেলে না একটা কলের মিস্ত্রি। ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকেও খবর দিলে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে না। রাজমিস্ত্রি যে কোথায় পাওয়া যাবে, তার হদিশ রাখেন না অনেকেই। কাঠের আসবাবের দোকান আছে অনেক কিন্তু বাড়ির কাজের জন্য ছুতোর মিস্ত্রি মেলে না সেখানে। যদি বা মেলে, এই মিস্ত্রিরা কেউই বাঙালী নয়। এই সব কাজে বাঙালী ছেলেদের লাগানো যায় না? একটা বড় মাপের ট্রেনিং সেন্টার খুলে বেকারভাতা পাওয়া ছেলেমেয়েদের এইসব কাজ তো শেখানো যেত গত তিন বছরে। তারপর এরা নিজেরাই কাজ জুটিয়ে নিতে পারত। একটা ছুতোর মিস্ত্রি বা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি মন দিয়ে কাজ করলে সাবজজ বা ইউ ডি ক্লার্কের চেয়ে বেশি রোজগার করতে পারে।

বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য কী করা দরকার? এর উত্তরে মিত্র মহাশয় বলেন, সমাধান খুব সহজ নয়। পুরোপুরি সমাধান তো এখন ভাবনার বাইরে। তবে সমস্যার এই তীব্রতা কমাতে দু'টি কাজ খুব জোরের সঙ্গে

করতে হবে। এক, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা : দুই, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রসার।

শিক্ষাবিদ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্যের শিক্ষক-জীবনের ৩৫ বছর পূর্ণ হল এই ১৯৮১ সালে। নিজে মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বেকার সমস্যার ব্যাপারটা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিবিদ ও প্রসাশকদের এক্তিয়ারভুক্ত হলেও, এর উত্তাপ সমাজের সবশ্রেণীর মানুষকেই ছুঁয়ে যায়। কেননা, বেকার সমস্যাই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। এর তীব্রতাও অনেক। ডঃ ভট্টাচার্য বললেন, আমার যত বয়স বাড়ছে, দেখছি বেকার সমস্যাও বেড়ে যাচ্ছে বৈ কমছে না। ফি বছরই দেখি আমাদের ছাত্রদের অনেকে কাজ পাচ্ছে না, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেকের বাড়ীতেই ছেলে মেয়েদের কাজ জুটছে না। ওদের মলিন মুখগুলি দেখলে কষ্ট লাগে বৈকি।

দেবীপদবাবু বললেন, পৃথিবীর সব দেশেই এই সমস্যা এখন দেখা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কথা যদি ধরা যায়, গোটা রাজ্যেই সর্বত্র কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বিপুল। শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের মধ্যেই বেকারের সংখ্যা বেশী। আবার ইদানীং মেয়েদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা খুব বেশী বাড়ছে। জমির একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। ইচ্ছে করলে তা বাড়ানো যায় না। আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যায় কিন্তু জমি বাড়িয়ে তো তাতে কর্ম সংস্থান করা যায় না। বাড়ানো যায় কল কারখানা। তা বাড়িয়ে আরও বেশী

সংখ্যক লোকের চাকরি দেওয়া যায়। সেটা কি প্রয়োজন মত করা হয়েছে? হয়নি। চিত্তরঞ্জন থেকে হাওড়া পর্যন্ত একটা সরলরেখা টানলে দেখা যাবে, এর দু'পাশে কিছু কলকারখানা হয়েছে। কিছু লোকের কাজও জুটেছে। কিন্তু অন্যত্র? জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, মালদহ, পশ্চিমদিনাজপুর, কোচবিহার—গোটা উত্তরবঙ্গে কোন শিল্প নেই। এখানকার ছেলেমেয়েরা কাজ পাবে কোথায়? কেমন করে? বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর—এই বিরাট এলাকাতেও কোন শিল্প গড়ে ওঠেনি। অথচ এইসব এলাকায় কর্মপ্রার্থী মানুষের সংখ্যা প্রচুর। তাদের কাজের ব্যবস্থা কোথায় হবে? দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে কাঠ ও তামাক শিল্পের প্রসার হতে পারত। কিন্তু, তেমনভাবে কিছুই হয়নি। কোচবিহারে তামাক শিল্পের বড় বড় কারখানা কি করা যেত না? আজও তেমন কিছু হয়নি। উত্তরবঙ্গে রয়েছে চা বাগান। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার পর চা বাগানগুলি মাড়োয়ারিদের হাতে গিয়ে, সেগুলি এখন মুমূর্ষু। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরে আমাদের সনাতন শিল্প একদা খ্যাতি অর্জন করেছিল। কিন্তু এখন তা ধ্বংস হওয়ার পথে। কেননা, এগুলি কেনবার মত বিরাট সংখ্যক ক্রেতা নেই। নেই, তার কারণ স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরেও দেশের শতকরা ৭০ জন লোকের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়েনি। এই অবস্থায় বেকারদের জন্য চাকরির সুযোগই বা বাড়বে কি করে?

শিল্পের জন্য যেমন চাই পুঁজি, তেমনি চাই শ্রমিক। পশ্চিমবাংলায় এই দু'টোরই অভাব। এই রাজ্যে বাঙালীর হাতে পুঁজি নেই। বলতে গেলে পুঁজির বেশীরভাগটাই অবাঙালীদের হাতে গিয়ে পড়েছে। দুঃখের কথা এই রাজ্যে শ্রমিকদেরও একটা বড় অংশ বাঙালী নয়। কাজেই বাঙালীর স্বার্থে এ রাজ্যে শিল্পের তেমন প্রসার ঘটেনি। এখনও ঘটছে না। বাঙালীর কর্মসংস্থানের সুযোগ এ রাজ্যে সত্যিই খুব কম। এই রাজ্যের পুলিশবাহিনীতে বিহারী উত্তর প্রদেশীর সংখ্যাই বেশি। উত্তর প্রদেশে ক'জন বাঙালী পুলিশ আছে? এই রাজ্যের-ট্রাম চালক ও কনডাক্টরদের বেশির ভাগই অবাঙালী কেন? কলকাতায় কালোয়ারপট্টির সীমানা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এইরকম অজস্র

উদাহরণ দেওয়া যায়। ব্যবসায় নেই, চাকরিতেও সংখ্যালঘু। এসব ঘটনা ঘটেছে বা ঘটানো হয়েছে। আমরা বুঝিনি বা বুঝতে চাইনি। কিন্তু এখন এটা অন্তত বেশ বোঝা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে বাঙালীরা খুবই বিপাকে পড়েছে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর দায় ছিল অবশ্যই সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকার বড় বড় শিল্প কিছু করেছেন। কিন্তু তাঁদের এতাবৎকাল অনুসৃত শিল্পনীতি পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে খুব সুফলদায়ক হয়নি। রাজ্য সরকারও তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেননি। গত তেত্রিশ বছর ধরে এই রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য কোনরকম সার্থক প্রয়াস চালানো হয়নি। সময়ে সময়ে কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলি রূপায়িত করার কোন বিশেষ চেষ্টা করা যায়নি। আর পাঁচটা সরকারী কাজের মতই এক্ষেত্রেও পরিকল্পনাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাগজে কলমে থেকে গিয়েছে। সম্প্রতি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উজ্জীবনের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। দেখা যাক কী হয়।

দেবীপদবাবু মনে করেন, বাঙালী শিক্ষিত ছেলেরা আরও একটা ব্যাপারে খুব পিছিয়ে পড়ছে। আই এ এস ও এই ধরণের সর্ব ভারতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালীদের সাফল্যের তালিকা খুব ছোট হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে যে সব বাঙালীর নাম পাওয়া যায়, তারাও প্রায় সবাই প্রবাসী বাঙালী। এতে নানা দিক থেকে ক্ষতি হচ্ছে। সাধারণভাবে এই রাজ্যের ও এই রাজ্যের অধিবাসীদের জন্য যদি কিছু করতেও হয়, তাহলে এই রাজ্যের লোকজনদের আরও বেশি করে সর্বভারতীয় প্রশাসনে ঢুকে পড়া উচিত। ওঁর মতে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য আপাততঃ দু'টি কাজ এখনই করা দরকার। এক, জেলায় জেলায় শিল্প গড়ে তোলা। দুই, সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আরও বেশি করে এই রাজ্যের ছেলেমেয়েদের যোগ দেওয়া ও সাফল্য অর্জন করা। চেষ্টা করলে বাঙালী ছেলেমেয়েরা সফল হতে পারে। পারবেও।

লেখক

গল্প লেখক মনোজ বসু বেকার সমস্যা নিয়ে কথা বলার গোড়াপত্তন করলেন গল্প দিয়েই। ১৯৫৬ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া গিয়েছিলাম। সেখানে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। অল্প বয়স। তাকে বললুম, তুমি কি করো? ছেলেটি জবাব দিলে, আমি ৬ মাসের ছুটিতে আছি। ফের প্রশ্ন করলুম, এত ছুটি কেন? কোথায় কাজ করো তুমি? ছেলেটি বললে, কাজ করি না। তবে করতে যাব। তার জন্যই তো ছুটিতে আছি। আমি অবাক। পরে সে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে। ছেলেটি পড়াশোনা শেষ করেছে। পরীক্ষার ফল সঙ্গে সঙ্গে বের হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই ওকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমার জন্য এতগুলি চাকরি আছে। তুমি কোনটা নেবে, বেছে নাও। ছেলেটি একটি চাকরি বেছে নিয়েছে। ৬ মাস পরে সেই চাকরিতে যোগ দিতে হবে। চাকরি করার আগেই ছুটি। ছেলেটি সেই ছুটি কাটাচ্ছে।

এই ছবি আমাদের দেশের ঠিক বিপরীত। আমাদের দেশের চাকরি বাকরি কাজকর্মের যে ছবি নিত্য ফুটে ওঠে, তা ওদের দেশে বেমানান। এখানে কোন বেকার ছেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার ওই বিদেশী ছেলেটির মুখ মনে পড়ে যায়। ভারী আশ্চর্য হই, আশ্চর্যরকম দুঃখ বোধ করি যে, স্বাধীনতার পর দেশে বেকার সমস্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। ওই চেকোশ্লোভাকিয়ায় শুনেছি, আগে থেকেই হিসাব করা হয় অমুক বছরে কতজন ডাক্তার, কতজন ইঞ্জিনীয়ার, কতজন প্রশাসক, কতজন বিদেশের দূতাবাসে কাজের লোক লাগবে। এই রকম সব কাজেই লোকের প্রয়োজন দেখে একটা হিসাব করা হয়। তারপর ততজন ডাক্তার,

ইঞ্জিনীয়ার, অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর, ক্লার্ক তৈরির জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। অর্থাৎ গোটা ব্যাপারটার পিছনেই আছে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা। আর আমাদের দেশে এই ধরণের কোন পরিকল্পনাই নেই। তাই গোটা ছ'য়েক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হল কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না।

পরিকল্পনাবিহীন কাজ কত মারাত্মক তার দু'একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমাদের সময়ে ওকালতির দিকে খুব একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। সবাই উকিল হওয়ার জন্য আইন পড়তে লাগল। পাশও করল। কিন্তু ততদিনে তো সব বেঞ্চও দখল হয়ে গিয়েছে। পরে এমন একটা সময় এল, যখন উকিল হলে আর পেটের ভাত জোটেনা। বিশ বাইশ বছর আগে দেখলুম খুব সিভিল ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার চেষ্টা চলছে। কিছু দিন পরেই দেখি সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে অনেক ছেলেই হা চাকরি হা চাকরি করছে। এখন আবার দেখছি মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ারিং শেখার ঝোঁক হয়েছে। এরা আবার কবে বাড়তি হয়ে যাবে, কে জানে? সেইজন্যই বলছিলাম, বেকার সমস্যার সমাধানের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা করা উচিত।

মনোজবাবু বললেন, দেশ স্বাধীন হল। বেশ কিছু বড় বড় শিল্প হল। ভালই হল। এরও দরকার ছিল। কিছু কাজের ব্যবস্থাও হল। কিন্তু এতে তো বেশীর ভাগ লোকের কর্মসংস্থান করা যাবে না। তারজন্য দরকার ছিল গান্ধীজীর পথে গ্রামগুলিকে কৃষি ও ক্ষুদ্র-কুটির শিল্পে স্বয়ম্ভর করে তোলার নীতি গ্রহণ করা। গান্ধীজীর শিষ্যদের হাতেই দেশের শাসনভার গিয়ে পড়ল, কিন্তু এই কাজটা আর করা হল না। দেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে থাকে। তাদের জীবিকা চাষবাস। এখানে একটা গোলমাল আছে। জমি বাড়ে না, কিন্তু মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এই ছবিটার দিকে তাকালে মনে হয়, জন্মশাসন খুবই দরকার।

আসল কথাটা হল, এই বলে মনোজবাবু বেকার সমস্যার মৌল কারণটি ব্যাখ্যা করেন, একটি দেশের পক্ষে সেই দেশের মানুষজনের একটা অর্থনৈতিক সংজ্ঞা

আছে। মানুষ মাত্রেই একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ। কয়লা, লোহা, বন ইত্যাদির মতই মানুষের বুদ্ধি ও কায়িক শ্রমও প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদকে যথাযথ কাজে না লাগানো বা নষ্ট হতে দেওয়ার অর্থ দেশেরই ক্ষতি করা। দেশের শাসনকর্তারা এটা যে জানেন না, তা নয়। কিন্তু এই সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য যে আয়োজন করতে হয় এবং সেই আয়োজনের জন্য যে পরিকল্পনা করতে হয়, তা আমাদের দেশে এখনও ঠিকঠাক করা হয়নি। বিপত্তি তো সেইখানেই।

সাংবাদিক

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি অবিকল রাশিয়ার জারের আমলের অবস্থার মতন। এই অভিমত প্রবীণ সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের। আমাদের দেশে বেকার সমস্যার ভয়াবহতার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিবেকানন্দবাবু এইভাবে শুরু করেন। তিনি বলেন, আমি ধনতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী নই। আমি মনে করি, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রাষ্ট্রগঠন করা না হলে দেশের আপামর জনসাধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোও সম্ভব নয়। রাশিয়ার জারের আমলে মানুষের দারিদ্র্য ছিল সীমাহীন। অধিকাংশ মানুষের রুটি রোজগারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষার হার ছিল অত্যন্ত কম। শিল্পব্যবস্থা ছিল সীমিত। ভারতে, স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরেও প্রয়োজনের অনুপাতে এই একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর

দেশের চেহারা বদলাতে থাকে। বিপ্লবের ২০ বছরের মধ্যে বেকার সমস্যা দূর হয়ে যায়, ২৩ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর হয়ে যায় আর শিল্পে স্বয়ম্ভরতা আসে ৩০ বছরের মধ্যে। চীনেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর। কিন্তু, ভারতে এইরূপ কোন বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। ভারতে এখনও পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থাই কায়েম আছে। এই শাসন ব্যাবস্থায় বেকার সমস্যার সমাধান কিছুতেই সম্ভব নয়। এমন কি, এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, তাহলে আগামী ১০০ বছরেও বেকার সমস্যার সমাধানের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

বিবেকানন্দবাবু বলেন, পুঁজিবাদী বা ধনবাদী শাসন ব্যবস্থা আছে বলেই দেশের শিল্পব্যবস্থা মানুষের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে গড়ে ওঠেনি। গোটা শিল্পই মুষ্টিমেয় লোকের হাতে আবদ্ধ আছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য, মুনাফা অর্জন করা। স্বাধীনতার পর ভারতে শিল্পের অগ্রগতির যে ছবি দেখানো হয়, তার মৌল চরিত্রটি হচ্ছে ওইরকম। এই অগ্রগতিতে মুষ্টিমেয় শিল্পপতি পরিবারেরই আর্থিক উন্নতি হয়েছে, দেশের সাধারণ মানুষের কিছুই হয়নি। ফলে, বেকার সমস্যা যেমন একদিকে বেড়েছে, তেমনি অন্যদিকে কর্মরত মানুষের মধ্যেও অভাব অভিযোগ ক্রমবর্ধমান। এর একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। ধনবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এখন বিশ্বের সব কয়টি ধনবাদী দেশেই বছরের পর বছর মানুষের অত্যাবশ্যক পণ্যের দাম বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গত কুড়ি বছরে অত্যাবশ্যক পণ্যের দাম বাড়েনি। ধনবাদী দেশগুলিতে এই মুহূর্তে দেড় কোটি মানুষ বেকার। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বেকার নেই। কাজেই, বেকার সমস্যার মত একটি বিরাট সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুললে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুতর বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী বৈষম্য থাকে। এই শ্রেণী বৈষম্যের ভিত্তি অর্থনৈতিক তারতম্য। এই ব্যবস্থা থেকেই মানুষের মনে দেখা দেয়

বিভেদের বীজ। ক্রমে সেই বীজ বিচ্ছিন্নতাবাদের মহীরুহে পরিণত হয়ে সর্বনাশকে ত্বরান্বিত করে।

বেকার সমস্যার এই তীব্রতার আরও একটি কারণ আছে। বিবেকানন্দবাবু বলেন, ভারতের শিল্পায়নের পরিকল্পনা প্রথম করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। এটা দেশ স্বাধীন হওয়ার আগের কথা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পণ্ডিত জহরলাল নেহরু হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি সুভাষচন্দ্রের জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক ও শিল্প পরিকল্পনার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তা প্রয়োগ করতে পারেননি। এর জন্য মূল ধরে নাড়া দেওয়ার দরকার ছিল। জহরলালজী তা করতে পারেননি। সাবেক ধনবাদী আদর্শে গড়া শিল্প ব্যবস্থার উপর নতুন নতুন পরিকল্পনাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে, ইংরাজ সম্রাজ্যবাদের অবসানের পরেও ভারতের শিল্প ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন হতে পারেনি।

একটি প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দবাবু বলেন, বিশেষ করে বাঙালীদের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে এ অভিযোগ অস্বীকার করা যায় না যে, বাঙালীরা পরিশ্রমের কাজগুলিতে আদৌ আগ্রহ বোধ করে না। বেকার সমস্যা বলতে অবশ্যই কেবল আপিসে চাকরি পাওয়ার সমস্যা বোঝায় না। ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পে আত্মপ্রতিষ্ঠাও বোঝায়। এখানে বাঙালীরা খুব সুবিধা করতে পারেনি। দেশ ভাগ হওয়ার পর যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হল, নতুন করে সামাজিক বিন্যাস শুরু হল, চাহিদার পুনর্বিন্যাস ঘটতে লাগল, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেননি। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের বড় অংশটাই বিদেশী মালিকানা থেকে সরাসরি অবাঙালী মালিকদের হাতে চলে গেল। টাকার জোর নেই বলে বাঙালীরা সেগুলি নিতে পারেনি, আবার নিজেদের হাতে যা ছিল, তাও সবটা ধরে রাখতে পারেনি। মালিকানায় বিদেশী থেকে অবাঙালী—এই পরিবর্তনে বাঙালীর ভাগ্য আগেও যা ছিল, পরেও তা রয়ে গেল। স্বাধীনতার পর নতুন প্রজন্মের কাছে ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পের বাজার খুব

সহজগম্য হয়নি। এটা যেমন সরকারী তরফের ব্যর্থতার কথা এবং ধনবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প করতে হলে যতটা উদ্যম, পরিশ্রম ও নিষ্ঠার দরকার, বাঙালীদের মধ্যে তা কমই দেখা যায়। ইতিমধ্যে বেকার সমস্যার তীব্রতা বাড়িয়েছেন আর এক শ্রেণীর লোক,যাঁরা কিছু লেখাপড়া শিখেছেন। তাঁরা সকলেই চাকরি-সন্ধানী, ব্যবসা বা অন্য ধরণের কাজে আগ্রহী নন। তাই আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই বেশি।

ঘটনার ব্যাখ্যা যাই হোক, মূল সমস্যাটা রয়েছে দেশের শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর। বিবেকানন্দবাবুর মতে ধনবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় বেকার সমস্যা অনিবার্য ঘটনা। এটা ঘটবেই। প্রতিকারের উপায় মূলে নাড়া দেওয়া অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বদল করা অর্থাৎ ধনবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় উত্তরণ। এই বিপ্লব বড় প্রয়োজন।

রাজনীতিবিদ

স্বাধীনোত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে অতুল্য ঘোষ একটি পরিচিত নাম। পশ্চিম বঙ্গে তাঁর ভূমিকাই ছিল একসময় রাজ্য রাজনীতির নিয়ন্তা শক্তি। স্বধীনতার পূর্ববর্তীকালে গান্ধীবাদী সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। সম্ভবত, অতুল্যবাবু সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাজনীতিবিদের একজন, যাঁরা মাটির উপর দাঁড়িয়ে মাটির কাছাকাছি থেকে মাটির মানুষজনের সুখ দুঃখের কথা জানেন। কাজেই দেশের ভয়াবহ বেকার

সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মতামতের একটা দাম আছে। কিন্তু গোড়াতেই উল্টো সুর। আমার প্রশ্নের উত্তরে উনি খুব সরল ভঙ্গীতে বললেন, পশ্চিমবঙ্গে কোন বেকার সমস্যা নেই।

সে কি!

এবার উনি প্রাঞ্জল করে বললেন, ভারতের সব রাজ্যেই বেকার সমস্যা আছে। ওই সব রাজ্যে তেমন কাজ নেই। কাজ আছে কেবল পশ্চিমবাংলায়। তাই প্রতি বছর অন্য রাজ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আসে এই পশ্চিমবঙ্গে কাজ করতে। তারা আসে। কাজ পায়। আহারের সংস্থান হয়। বাসস্থানের যোগাড় হয়। এই রকম চলছে। চলছেই তো। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে কাজ নেই কথাটা কি ঠিক হল?

এর পর তিনি আরও বিশদ করে বলেন, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই, পশ্চিমবঙ্গে কাজ আছে। তাতে লোকজনের চাকরিও হচ্ছে। তারা কেউ পশ্চিমবঙ্গের লোক নয়। অন্য প্রদেশের। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে যে কাজ আছে, তার সবটাই বাঙালীর জন্য নয়। কারণ, ওই সব কাজে বাঙালীরা চাকরি করে না। ঘরের দোরে চাকরি থাকতে যদি কেউ না করে, তাহলে তো বেকার থাকতেই হবে।

তাহলে কি একথা বলতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা নেই কিন্তু বাঙালীর বেকার সমস্যা রয়েছে?

এর উত্তর অতুল্যবাবু বললেন, পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা নেই, তা বলছি না। তবে বাঙালীর বেকার সমস্যার এই ভয়াবহতার একটা বাড়তি কারণ আছে। বেকার সমস্যা এখন বিশ্বজুড়ে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার দরুণই সব দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। ভারতও এর বাইরে নয়। ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও মজবুত হতে পারেনি। তাই এখানেও বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও এইসব কারণ সত্য। কিন্তু এই রাজ্যের অধিবাসী বাঙালীদের যে বেকার সমস্যা, তার জন্য বাঙালীরাই অনেকাংশে দায়ী। এটাকেই বলছি বাড়তি কারণ। পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চলে কয়েক লক্ষ শ্রমিক আছে। সেখানে বাঙালী শ্রমিক নেই কেন? হুগলি নদীর তীরে যে চটকলগুলি আছে, তাতে বাঙালী শ্রমিক তো হাতে গোনা যায়। পৃথিবীর সবদেশেই সেখানকার রেল স্টেশনে কুলির কাজ করে সেই দেশের লোকেরাই। ভারতেও গুজরাটে রেলকুলি সেই রাজ্যের অধিবাসী। বোম্বাইতে রেল স্টেশনে কুলির কাজ করে বোম্বাইওয়ালারা। মাদ্রাজে স্টেশনে স্টেশনে রেলের কুলি মাদ্রাজীরা। বিহারেও বিহারীরাই কুলির কাজ করে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই রেল স্টেশনগুলিতে এই রাজ্যের অধিবাসী বাঙালীরা কুলির কাজ করে না। কলকাতায় যত রিক্সাওয়ালা আছে, তার একজনও বাঙালী নয়। কলকাতায় যত কলের মিস্ত্রী আছে, সব ভিন রাজ্যের লোক। কলকাতায় যত ইলেকট্রিক মিস্ত্রী আছে, তার ৮০ শতাংশ অবাঙালী। কলকাতা কর্পোরেশনের শতকরা ৯০ জন মজুর অন্য রাজ্যের অধিবাসী। এই যে এত অসংখ্য কাজ, এগুলি বাঙালীরা কখনও করেনি। এখনও করছে না। করছে না বলে তো কাজগুলি শূন্য পড়ে থাকবে না। সেগুলি চলে গিয়েছে অন্য রাজ্যের লোকজনদের হাতে। এই ভাবে বাঙালীরা নিজেদের কাজগুলি অন্যের হাতে তুলে দিয়েছে। বাঙালীরা এসব কাজ করে না কেন? কারণ, এগুলি পরিশ্রমের কাজ। পরিশ্রম করতে না পারলে, পরিশ্রমের কাজগুলি থেকে দূরে সরে থাকলে, বেকার সমস্যা তো বাড়বেই। সবাই যদি ডাক্তার, উকিল আর অফিসবাবু হতে চায়, তা হলে চলবে কেন। এত ডাক্তার, উকিল আর অফিসের বাবুর জন্য চাকরি পাওয়া যাবে কোথায়?

পরিশ্রম না করাটা বাঙালীর একটা মজ্জাগত দোষ। যে ছেলে তিনবারেও ম্যাট্রিক পাশ করতে পারছে না, তাকে ম্যাট্রিক পাশ করানোর জন্য বাবা মার চেষ্টার অন্ত নেই। ছেলেকে ভদ্র বাবু বানাতেই হবে। এই মানসিকতা বাঙালীর কর্মসংস্থানের সুযোগকে সঙ্কুচিত করে ফেলেছে। পরিশ্রমের যে সব

কাজ আমরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছি, এখন করতে চাইলেও তা সহজে মিলবে না। মিলছেও না। যাদের ছেড়ে দিয়েছি, তারা এখন আমাদের ছেড়ে দেবে কেন? এর জন্য অবশ্য, অতুল্যবাবু গভীর আবেগের সঙ্গে বলেন, আমাদের ছেলেদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরা যে রকম শিক্ষা দিয়েছি, তাতে ছেলেদের পঙ্গু করে তুলেছি। আমরা ওদের বাবু হ'তে শিখিয়েছি, কিন্তু নিজের মোট নিজে বইতে শেখাইনি। দায়ী যদি কেউ হন, তবে আমরা অভিভাবকরাই এর জন্য দায়ী।

বাঙালী কোথায়?

১. হতাশ হওয়ার কিছু নেই

২. আমরাও পারি

বাঙালী কোথায়?

১. হতাশ হওয়ার কিছু নেই

২. আমরাও পারি

হতাশ হওয়ার কিছু নেই

ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে বাঙালীর হালফিল অবস্থাটা কি? এই ছিল তদন্তের বিষয়। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিশিষ্টজনের ব্যাখ্যা—কেন বাঙালীরা শিল্পে বাণিজ্যে বা ব্যবসায় তেমন সাফল্য লাভ করতে পারে না। এই দ্বিবিধ সংবাদ নিবন্ধ রচনার উপাদান সংগ্রহ করতে আমাকে বহু প্রতিষ্ঠানে যেতে হয়েছে। কথা যা শুনেছি, তথ্য যা সংগৃহীত হয়েছে, লেখা হয়েছে তার অল্পই। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে, আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। শিল্পে বাণিজ্যে বা ব্যবসায় বাঙালীর দুরবস্থার কথা লেখা হয়েছে। আত্মসমীক্ষার নামে বাঙালীর ব্যর্থতার জন্য চরিত্রদোষের উল্লেখ করতেও কেউ কেউ কার্পণ্য করেননি। তবু আমার অভিজ্ঞতা, হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এখন অনেক বাঙালী যুবকই ব্যবসা, বাণিজ্য শিল্পে আরও বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসছেন। হয়ত ছোট মাপে, সামান্য আয়োজনে। সরকারী দাক্ষিণ্য পেলে এঁরাই একদিন বড় হতে পারবেন।

এ কথা ঠিক, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে বাঙালীর পিছিয়ে পড়ার কথা বলতে গিয়ে অনেকেই নানা ধরণের দোষত্রুটির কথা বলেছেন। আমার মনে হয়েছে এ ব্যাপারে বাঙালীর ত্রুটি দুটি। এক, বাঙালী স্বজনশ্রীকাতর। এর স্বপক্ষে অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য এখানে উল্লেখ করছি। দিল্লিতে অন্য প্রদেশের সংসদ সদস্যরা যে দলের লোক হোন না কেন, রাজ্যের জন্য যথাসম্ভব সুযোগ সুবিধা আদায় করার ব্যাপারে তাঁরা এক কাট্টা। পশ্চিমবঙ্গের সংসদ্ সদস্যরা একে অন্যের প্রতি তথাকথিত রাজনৈতিক বিদ্বেষ হেতু পরস্পর এতই দূরবর্তী যে রাজ্যের স্বার্থেও তাঁরা কখনও একজোট হতে পারেন না। এই বিদ্বেষের মূলে কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শবাদ তত বড় নয়, যত বড়

স্বজনশ্রীকাতরতা। বাঙালীরা যেন নিজেদের লোকের শ্রীবৃদ্ধিতেই সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়ে থাকে।

দ্বিতীয় কারণটি হল, বাঙালীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব। ব্যবসা করতে নেমে একজন গুজরাটি যুবক তাঁর জাতভাইদের কাছ থেকে যে রকম সাহায্য ও সহযোগিতা পান, একজন বাঙালী যুবক তা পান না তাঁর জাতভাইদের কাছ থেকে ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প গড়তে। এই ধরণের সম্প্রদায়গত বা জাতিগত সাহায্য ও সহযোগিতা খুব জরুরি। একমাত্র বাঙালীর মধ্যেই জাতপাঁতের কোন ব্যাপার নেই।

তবু বিপদে পড়লে বাঘেও ধান খায়। দেশ বিভাগের পর এই বিপদ হাজার গুণ বেড়েছে। বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত, পশ্চিমবঙ্গে বিপুল উদ্বাস্তু আগমন, চাকুরির সুযোগ সঙ্কুচিত। এই অবস্থায় ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পে হাজারে হাজারে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। রয়াল বেঙ্গল টাইগারের প্রতিবেশী হয়েও এই বিপদে বাঙালী ধান খেতে শিখল না। এর প্রধান কারণ, পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকার কখনই আন্তরিকভাবে চাননি, এই রাজ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন করে ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পের প্রসার ঘটুক। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এর সমর্থনে অসংখ্য নজির উপস্থিত করা যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সব প্রদেশেই শিল্প গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকারগুলি উদ্যোগী ছিলেন। এর ফল, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কেরল, তামিলনাড়ু। অথচ, ওইরকম কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলেই শিল্পের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গ আজ এতটাই পিছিয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের উদ্যোগের অভাব ছাড়াও কয়েকটি মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কয়লার দামে সমতা রক্ষার নীতিতে রাজি হয়ে পশ্চিমবাংলার সর্বনাশ করেছেন। কয়লা ও লোহা অন্য রাজ্যে নিয়ে যেতে যদি রেল-শুল্কে ছাড় দেওয়া হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের জন্য তুলো ও রাসায়নিক দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে ভর্তুকি নয় কেন? বিধানবাবু এই রাজ্যে বিদেশী ওষুধ নির্মাতাদের

যৌথ শিল্প গড়তে উৎসাহ দেননি। বিধানবাবু গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার নীতি গ্রহন করেননি। এই রকম অনেক উদাহরণ দেখানো যায়। আজও তার জের চলছে। পরবর্তী কালেও কোন সরকারই ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প গড়ে তুলতে রাজ্যের সন্তানদের জন্য কোন বিশেষ উদ্যোগ নেননি।

এত সব সত্ত্বেও কিন্তু আমার ধারণা হয়েছে, হতাশায় ভেঙে পড়ার কোন কারণ নেই। স্বাধীনতার তেত্রিশ বছরে স্বাভাবিক নিয়মে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষার প্রসার হয়েছে। নতুন এক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বেশি সংখ্যক মানুষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, চাকরির সুযোগ তুলনামূলকভাবে কমেছে। বাঁধা মাইনের চাকরিতে চোখের সামনে সামগ্রিক স্বাচ্ছন্দ্য কেনা সম্ভব নয়। এইসব কারণে এখন অনেক বাঙালী যুবক ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প গড়ার দিকে ঝুঁকছে। আরও অনেকেই আসতে পারেন, যদি রাজ্য সরকার নিজে উদ্যোগী হতে পারেন।

আমরাও পারি

আমরাও পারি। বাঙালীরাও পারে, এত দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, এত প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও। তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দুই তরুণ শিল্পোদ্যোগীর কথা। কেবল একটিই নয়, মনে রাখতে হবে, এইরকম দৃষ্টান্ত আরও কিছু আছে। আরও বেশি হওয়া দরকার। এদের একজন বজবজের অজয় চক্রবর্তীর চাকরি করাটাই একটা অপমানজনক ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। বাঙালী যুবকের পক্ষে এইরকম মনে হওয়াটা একটা অদ্ভুত ঘটনা সন্দেহ

নেই। এই ঘটনাই অজয়বাবুকে অনিবার্যভাবে কারখানা বানাতে বাধ্য করে। অন্যজন নাগেরবাজারের সাধন রায়চৌধুরী। বি এ পাশ করার পর তিন বছর আপ্রাণ চেষ্টা করেও কোন চাকরি জোটাতে না পেরে লেদ মেশিনের হাতলে হাত রাখেন। এখন দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছেন শক্ত মাটির উপর। চলার পথে নানা বাধা। আবার সে বাধা অতিক্রমও করেছেন। ওঁদের মধ্যে কোন হতাশার গ্লানি নেই, পরাজয়ের দীনতা নেই। এবং ওঁরাও বাঙালী।

তারা ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কসের মালিক অজয় চক্রবর্তীর বয়স এখন ৪৫ বৎসর। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, নাতি দীর্ঘ পাকানো শরীর। টেকনিক্যাল স্কুল থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং সম্পর্কে শিক্ষা শেষ করে একটি কারখানায় শিক্ষানবিশ ছিলেন। ওই সময়ই অপমানজনক মনে হওয়ার ঘটনাটি ঘটে। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাই কারখানা ছেড়ে উন্মুক্ত আকাশের তলায়। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করার পর শুরু করলেন মাত্র ৩০০ টাকা সম্বল করে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ। বন্ধু বান্ধবের কারখানায় কাজ করিয়ে নিতেন। আস্তে আস্তে কাজ শিখতে লাগলেন। টেণ্ডার দিতে শিখলেন। কাঁচামালের বাজারে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। সাহস বাড়ল। তারপর ১৯৬৫ সালে বড়দার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে একটি লেদ মেশিন কিনে কারখানা খুলে বসলেন। আরও অনেকে অল্প স্বল্প টাকা দিয়ে সাহায্য করলেন। এই হল শুরু।

শক্তি ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর সাধন রায়চৌধুরীও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। লম্বাটে পাকানো চেহারা। বেশ ডাকাবুকো ছেলে এখন বয়স ৩৮ বৎসর। সহজে কোথাও হেরে যাবার লোক নয়। ১৯৬৫ সালে মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ থেকে বি এ পাশ করার পর চাকরির সন্ধানে ব্যয় করেছেন তিনটি বছর। যেমন তেমন একটি চাকরিও জোটে নি। শেষ পর্যন্ত দুই বন্ধুর সহযোগিতায় নিজেদের বাড়িতেই একটি কারখানা খুলে বসলেন। বাবা দিলেন প্রাথমিক মূলধন ১৫ হাজার টাকা। পরে আর বন্ধু দু'জন রইলেন না। সব দায় এসে

পড়ল একা ও'র উপর। ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের কিছু জানেন না কিন্তু দমবার পাত্র নন। ঘা খেতে খেতে চলতে লাগলেন। এখন অনেকে আসেন ওঁর কাছে পরামর্শ নিতে। ১৯৭০ সালে কারখানার পত্তন করার পর থেকে সাধনবাবুর ওই কারখানাই ধ্যান জ্ঞান।

ওঁরা হু'জনেই বিবাহিত। সন্তানসন্ততিও আছে। অজয়বাবুরা পশ্চিমবঙ্গের লোক। কিন্তু সাধনবাবুরা অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলার লোক। ব্যবসা চালাতে গিয়ে হু'জনেই অভিজ্ঞতার দিক থেকে এই বয়সেই বয়োবৃদ্ধ। এবং হু'জনের অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে অপূর্ব সাদৃশ্য। হু'জনেই বলেছেন অর্ডার সংগ্রহ করা, মাল তৈরি করা, মাল ডেলিভারি দেওয়া ও পেমেণ্ট আদায় করা— এসব ব্যাপারে তাঁরা বহুজনের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে থাকেন। অর্ডার পেতে খুব অসুবিধা হয় না তবে, টাকার অভাব আছে। ব্যাঙ্ক থেকে হু'জনেই প্রচুর সাহায্য পেয়েছেন। কিন্তু ব্যাঙ্কের টাকা সব সময় পর্যাপ্ত নয়। অজয়বাবু ঋণ পেয়েছেন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে। সাধনবাবু পেয়েছেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক থেকে। হু'জনেই বলেছেন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পেতে তাদের কিছু বন্ধক রাখতে হয়নি। তবে একজন করে জামিনদার হাজির করাতে হয়েছে। হু'জনেই বলেছেন, বড় বড় শিল্প সংস্থার বাঙালীর চেয়ে অবাঙালীদের কাছ থেকেই ওঁরা বেশি সাহায্য পেয়েছেন।

অজয়বাবুর কারখানায় এখন লেদ ছাড়াও নানা ধরণের ৮টি মেশিন আছে। কর্মীর সংখ্যা ১৪ জন। সাধনবাবুর কারখানায় আছে ৫টি লেদ মেশিন। কর্মী ৮ জন। অজয়বাবু বিভিন্ন সংস্থার নকশা অনুযায়ী যন্ত্রাংশ তৈরি করা ছাড়াও তৈরি করেন ডোর ক্লোজার, ফ্লোর স্প্রিং ও লক, অ্যালুমিনিয়ামের দরজা জানালা পার্টিশান, রোলিং ইত্যাদি। সাধনবাবুর দক্ষতা নানারকমের ডাইস নির্মাণে। হু'জনেই বলেছেন, ওঁদের কারখানার শ্রমিক হাঙ্গামা নেই। তবে, লোডশেডিংয়ের জন্য কাজের ক্ষতি হচ্ছে। সময়মত মাল ডেলিভারি দেওয়া যাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে এই কারণেই অর্ডার বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এখন লোক-

সানের কড়ি গুণতে হয়। অজয়বাবু কিস্তিতে ১০ কে ভি এ শক্তিসম্পন্ন জেনারেটার কিনতে চান। একসঙ্গে টাকা দিয়ে কেনার মত ক্ষমতা নেই।

দু'জনেই বলেছেন, কাঁচামাল পেতে অসুবিধা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব বেশী। এর ফলে অনেক সময় কম রেটে কাজ নিয়ে অনেকে কোয়ালিটি ঠিক রাখতে পারে না। কোয়ালিটি ঠিক রাখাটা অত্যন্ত জরুরি। কেননা, এটা একবারের কাজ নয়। কাজটা চালিয়ে যেতে হবে। সেখানে কোয়ালিটিই সুনাম ধরে রাখে। দু'জনেরই অভিযোগ, সরকারী নিয়ম কানুনের জটিলতা এইরকম ছোটখাটো শিল্পোদ্যোগীদের পক্ষে মস্ত বড় বাধা। আর একটি অসুবিধা হয় পেমেণ্ট নিয়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পেমেণ্ট পেতে ৬ মাস লাগে। দীর্ঘদিন ধরে এইভাবে টাকা আটকে থাকলে কাজ চালিয়ে যাওয়া কষ্টকর। সরকারী অফিসে তো পেমেণ্ট পেতে কখনও কখনও তিন বছর লেগে যায়।